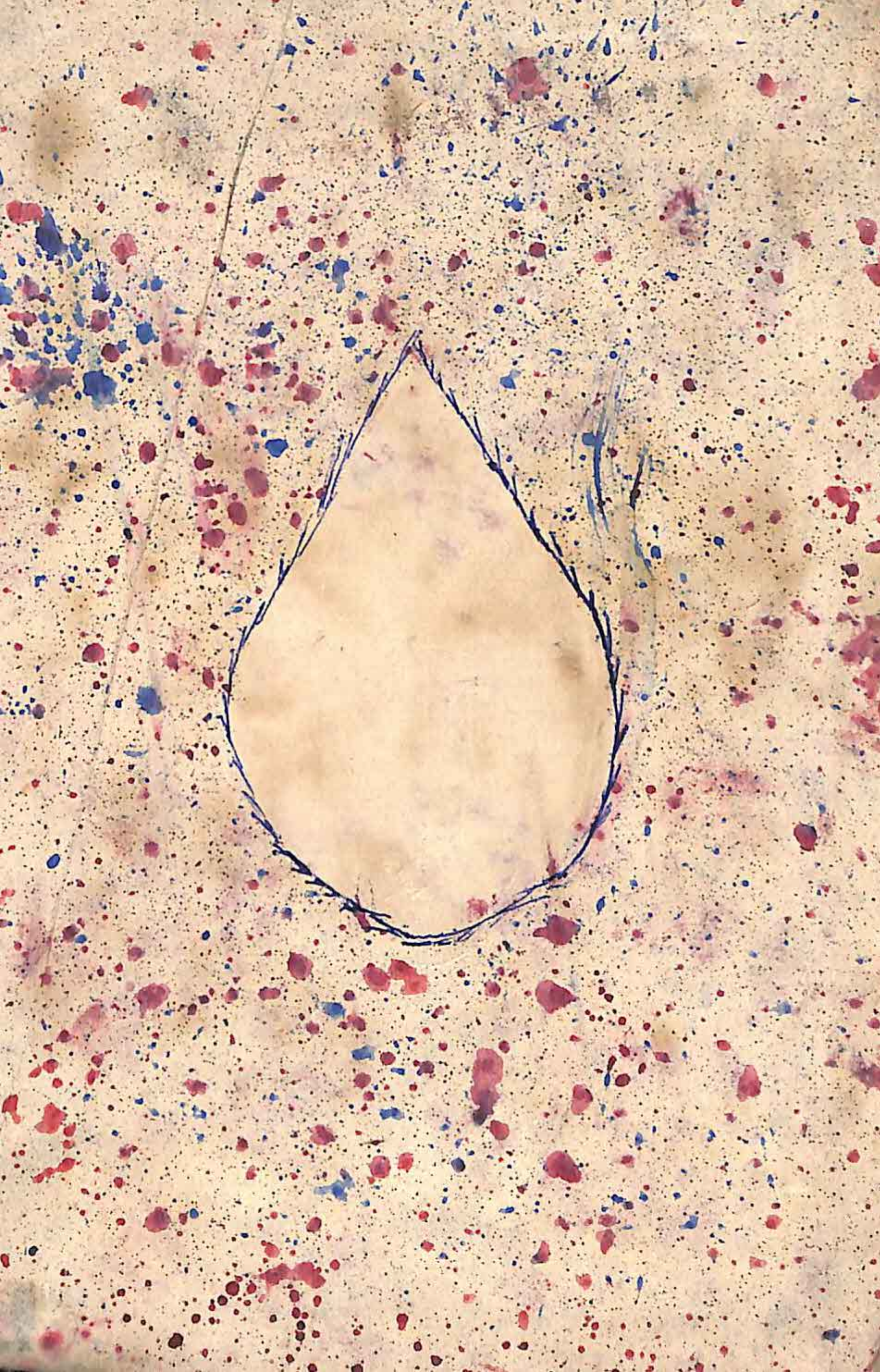


প্রকাশক
শ্রীঅজিত শ্রীমানী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

—দুই টাকা—

কান্তিক প্রেস
৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

লুপ্তশিখা

[১]

মামা এসেছেন।

আমার আপন মামা নয়—মায়ের পিসতুত ভাই। বিধবা হ'য়ে মা এক রকম এঁদের আশ্রয়েই এসে প'ড়েছেন। আলাদা একখানা কুঁড়ে ঘর তাঁর আছে, আমাকে নিয়ে সেখানেই থাকেন, কিন্তু খাওয়া পরার জন্যে বেশীর ভাগই হাত পাততে হয় মামাদের কাছে।

মামা ক'লকাতায় চাকরী করেন—কাজেই গাঁয়ের লোকে ... একটা কেষ্ট বিষ্টু ব'লে মানে। আর যখন তিনি আসেন ... কথাবার্ত্তা ক'ন ভারী চালে—গাঁয়ের লোককে পাড়া-গাঁ... লোকের চেয়ে বেশী কিছু কোনও দিনই মনে করেন না।

আমরা পাড়ার ছেলেরা অবাক্ হ'য়ে তাঁর দিকে শুধু চেয়ে থাকি। ভাগ্যিবান লোক—ক'লকাতায় থাকেন, চাকরী করেন একটা দেবতা ব'ল্লেই হয়!

আমার এই বারো বচ্ছর বয়সের মধ্যে আর একবার তিনি এসেছিলেন। আসতে বড় চান না,—পাড়াগাঁয় তাঁর মন টেঁকে না।

তা ছাড়া, ক'লকাতার কলের জল খেয়ে অভ্যাস, পুকুরের জলে তাঁর পেট খারাপ হয়, নদীতে নাইলে [illegible] হয়, গাছের হাওয়ায় জ্বর আসে। সব দিক দিয়েই যে তিনি আমাদের থেকে ভিন্ন, আলাদা জাতের মানুষ সেটা আমরা বেশ বুঝেছিলাম—যতই তাঁর পার্থক্য দেখতাম ততই বিস্ময়ে, প্রশংসায় অভিভূত হ'তাম।

গরীবের ছেলে আমি—পেটের অন্নেরই বিশেষ কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না, কাপড় চোপড় প্রভৃতি ফালতু জিনিষের তো কথাই নেই। কিন্তু বামুনের ছেলে ব'লে একটা অভিমান ছিল, কাজেই লেখাপড়াটা একেবারে বাদ যায় নি। গাঁয় একটা মধ্য ইংরাজী স্কুল ছিল, তার পড়া প্রায় সাঙ্গ হ'য়ে গিয়েছিল। যদিও ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে থাকতাম, তবু পরীক্ষাগুলো নিয়ম ক'রে দিয়ে গেছি।

এমন সময় মামা এলেন।

বাড়ীতে সে একটা পর্ব্ব ব'ল্লেও হয়! এমন কি সারা গাঁয় একটা সাড়া প'ড়ে গেল। ক'লকাতার চাকরে' সেকালের সেই গোবরাকে সবাই দেখতে এলো। বাড়ীতে মামীমার সুন্দর ফুটফুটে মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—হেঁসেলে একটা মাহোৎসবের জোগাড় লাগল।

মা ব'লে দিলেন, "মামা এলে সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, আর তার কাজ ক'রে দিবি, খুব সেবা করবি, বুঝলি?" কথাটার অক্ষরার্থ বুঝলাম, কিন্তু তাৎপর্য্য বুঝতে কিছুদিন দেরী হ'ল।

কিন্তু তবু লেগে গেলাম। মামা বাড়ীতে পা দিতেই গিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রলাম—তিনি অশ্রদ্ধার সঙ্গে একবার আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, "এ কে ?"

মা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ব'ল্লেন, "বটুক।"

"বটু ? তোমার ছেলে ? এত বড় হ'য়েছে ?"

তার পর দিন থেকে জোঁকের মত তাঁর গায় গায় লেগে রইলাম। যেখানে যান সঙ্গে যাই। পা ধোবার জল এনে দি, গামছাখানা ব'য়ে বেড়াই, ঘামাচি মেরে দি, এবং শুলে পরে তাঁর হুকুম মত গায় সুড়সুড়ি দি।

মামা তাতে খুসী হ'লেন কিনা ব'লতে পারি না, কিন্তু যে ক'দিন তিনি রইলেন সে ক'দিন সেবা নিতে কোনও কৃপণতা করেন নি। তামাক সাজা থেকে আরম্ভ ক'রে বাজারে দৌড়োন প্রভৃতি লাখো কাজের ফরমাস ক'রে দিবারাত্রি আমাকে পায়ের উপর খাড়া ক'রে রাখলেন।

শেষে মা কথাটা পাড়লেন।

মামা ব'সে খাচ্ছিলেন, মা দাওয়ার এক কোণায় আমাকে নিয়ে ব'সে দেখাশোনা ক'রছিলেন।

মা ব'ল্লেন, "দাদা বটুকের একটা গতি ক'রে দাও। হাজার হোক লোকে বলবে তোমারই ভাগনে। এখানে ব'সে থেকে থেকে ও কি উচ্ছন্নে যাবে, তোমার মত মামা থাকতে ?"—

প্রকাণ্ড এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে' খানিকক্ষণ চিবিয়ে তাকে কায়দা করে' নিয়ে মামা ব'ল্লেন, "কেন ? ও বুঝি খুব বজ্জাতি করে ?"

মা তাড়াতাড়ি ব'ল্লেন, "তা নয় দাদা, বটুক আমার ছেলে ভাল। তা, ওর এখানকার লেখাপড়া তো শেষ হ'য়ে এলো, এখন ও ক'রবে কি? গাঁয় ব'সে ব'য়ে যাবে, তাই বলছি।"

মামা ব'ল্লেন "হুম্।" গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। মার কথার লক্ষ্যটা বোধহয় আঁচ ক'রে ফেল্লেন।

মা ব'লে গেলেন, "তোমার মত মামা থাকতে"—ইত্যাদি।

ঢেঁকী গেলাবার মত উপরোধ।

মামা যেন একটু নরম হ'লেন। ভেবে চিন্তে হঠাৎ জিগ্‌গেস ক'রলেন, "হাঁ রে বটুক, তুই রাঁধতে জানিস?"

অতটা বিচার কর্‌বার বয়স আমার ছিল না, তাই খুব গর্ব্বের সঙ্গে ব'ল্লাম "হাঁ—সব রাঁধতে জানি।"

এ প্রসঙ্গে কথাটার কোনও সার্থকতা না থাকায় মা বোধ হয় মনে ক'রলেন যে তাঁর প্রস্তাবটা চাপা দেবার আয়োজন। অত সহজে কাবু হ'বার পাত্র তিনি নন। তাই কথাটা ধ'রে তিনি ব'ল্লেন, "সে সব জানে, জানবে না কেন? পাড়াগাঁয় থাকে, পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা যেমন হ'য়ে থাকে; মাছ ধ'রতে জানে, সাঁতার কাটতে জানে, রাঁধতে জানে, গাছে চ'ড়তে জানে। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলের আচার বিচার কিছুই শেখে নি। শিখবে কোত্থেকে, এখানে এই গাঁয়ের ছোটলোক ছেলেদের সঙ্গে দিন রাত মেলা মেশা। একটা সহুরে ভদ্রলোকের মুখ দেখতে পায় না। এমন ক'রলে তো চলবে না—ভদ্দর লোকের ছেলে, ভদ্রভাবে দুটো যাতে ক'রে খেতে পায়, দশজনের সঙ্গে মুখ তুলে

মিশতে পারে তা তো চাই। নইলে তোমার যে মুখ খাটো হবে।" ইত্যাদি দীর্ঘ প্রসঙ্গান্তে প্রস্তাব ক'রলেন যে মামা আমাকে ক'লকাতায় নিয়ে আমাকে মানুষ ক'রবার ভার নিন।

মামা ব'ল্লেন "হুম্।" গম্ভীরই রইলেন—ভাবতেও লাগলেন, কিন্তু তবু সুরটা যেন একটু নরম।

তার পর একদিন গেল। আমি তো লেগেই ছিলাম, মাও তাঁর পিছনে লাগলেন, আর বক্তৃতা ক'রে ক'রে শেষ পর্য্যন্ত মামাকে রাজী করিয়ে ছাড়লেন।

যখন মামা ব'ল্লেন "আচ্ছা" তখন ছাতিটা দশ হাত ফুলে উঠলো। হাওয়ার উপর উড়ে বেড়াতে লাগলাম। এক দৌড়ে গিয়ে পাড়ার সব ছেলেকে খবরটা দিয়ে এলাম। মনে হ'ল সবাই হিংসায় ফাটছে! ক'লকাতায় থাকবো—ক'লকাতার ইস্কুলে প'ড়বো, বাবা,—সোজা কথা? একটা অসামান্য কৌলীন্যবোধ আমার ওজনটা যেন হঠাৎ ভারী ক'রে দিল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে এটা তাদের বেশ ক'রেই জানিয়ে দিলাম যে আমি ঠিক তাদের মত আর নই।

অশোক ব'লে একটা ছেলে সে আর থাকতে পারলে না, সে ব'ল্লে, "আমার বাবা ব'লেছেন আমিও ক'লকাতায় যাব।"

কথাটা নিশ্চয় মিথ্যে; কেবল বাজার গরম ক'রবার জন্য ব'ল্লে। ও ছোঁড়া বরাবরই আমাকে ভারী হিংসে করে। আমার বন্ধুরা সবাই ঠিক ক'রলে অশোকের এটা মিথ্যে চালিয়াতি।

আমি ব'ল্লাম, "গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল—আর আমি কালই যাচ্ছি।"

পরে নবীন এসে আমায় খবর দিয়ে গেল অশোক বাড়ী গিয়ে বাপের কাছে ভয়ানক কান্নাকাটি ক'রছে ক'লকাতায় যাবে ব'লে। বাবা তাকে ধমকে দিয়েছেন।

আমার আনন্দটা আরও পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল।

*　　*　　*　　*　　*

ঘুরে এসেই মামার কাছে হাজিরা দিলাম। দেখি মামী সেখানে।

তাঁর পটোল চেরা চোখ দুটো লাল হ'য়ে ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল প'ড়ছে। ফুটফুটে রং তাঁর—মুখখানা যেন টুক্‌টুকে লাল হ'য়ে উঠেছে।

মামীমা সুন্দর ব'লে আমার তাঁর উপর একটু পক্ষপাত ছিল। আমিও সুন্দর ব'লে মামীমা আমাকে বড্ড আদর ক'রতেন। এমন আদর গাঁ'য়ের অনেক মেয়েছেলে আমায় ক'রতো, আর তাতে আমার রূপের দেমাকটা বেশ টন্‌টনে হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সবার চেয়ে এই মামীমার সঙ্গেই আমার ভাবটা ছিল বেশী।

তাই তাঁর কান্না দেখে আমার দুঃখ হ'ল। আহা, ক'বছর পর সোয়ামী এয়েছে, আবার আজই চ'লে যাবে—বেচারী আবার সেই একলা প'ড়ে থাকবে!

মামীমা ব'লছিলেন, "আমাকে ক'লকাতা নিয়ে চল।"

মামা ব'লছিলেন, "সে হয় না। ক'লকাতায় পরিবার নিয়ে থাকার বড্ড খরচ"—ইত্যাদি।

মামীমা ব'ল্লেন, "আহা খরচের ভয়ে তো ম'রে যাচ্ছ! বটুক যে থাকবে, তাতে খরচ লাগবে না? আমি কি বটুকের চেয়ে পর?"—

ও হরি! এ বলে কি? আমার সঙ্গে আড়ি!

ভয় হ'ল পাছে মামা মামীমার কথায় ভুলে আমাকে না নিয়ে ওকেই নেয়। আমার সব দরদ ঘুচে গেল—মামীমার উপর রাগ হ'ল। মেয়েমানুষ গুলো কেবল আছে, সব কথায় এমনি শুধু বাগড়া দিতে!

মামা উত্তরে যে যুক্তির অবতারণা ক'রলেন তার অকাট্য সারবত্তায় মন প্রশংসায় ভ'রে উঠলো, মনে মনে আমি গড় হ'য়ে তাঁকে প্রণাম ক'রলাম।

তিনি ব'ল্লেন, "আরে বটুক বেটা-ছেলে, ওর কি? ওর জন্যে কি বাড়ী ভাড়া ক'রতে হ'বে? ও কি ছেলে বিয়োবে? ওর ছেলের দুধ জোগাতে হ'বে? মেয়ে মানুষ চিরদিন অবুঝ; কি যে বল তার ঠিকানা নেই।"

মামীমা নিরুত্তর—কেমন জব্দ!

অনেকক্ষণ পরে চোখের জল মুছে শেষে মামীমা ব'ল্লেন, "আচ্ছা যাবেই যদি এত তাড়া কেন? আর ক'টা দিন থেকেই যাও না। চার বচ্ছর পর তো এলে!"

ও মা! এ আবার কি বলে? কাল যাব, আর আজ সন্ধ্যে বেলায় তাতে বাগড়া দেয়। না মামীটা নেহাৎ অভদ্র!

কিন্তু মামার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন? মামা ব'ল্লেন,

"যেন থাকা না থাকা আমার হাত। পরের চাকরী করি, আমি কি ইচ্ছা ক'রলেই থাকতে পারি? থাকি যদি চাকরীখানা যাবে। তার পর খাবে কি?"

কিছুতেই কিছু হ'ল না। মামা মন্দ মানুষ—তাঁর কথার নড়্ চড়্ হ'বার জো নেই।

বেরিয়ে প'ড়লাম পরের দিন। মা কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আশীর্ব্বাদ ক'রে আমায় মামার হাতে সঁপে দিলেন। আমার মাথায় চুমো খেলেন—আর দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। আমার কিন্তু এক ফোঁটাও কান্না পেল না। ক'লকাতা যাবার স্বপ্নে সারারাত বিভোর হ'য়ে কাটিয়েছি—এখনও সেই ভূস্বর্গের স্বপ্ন দেখছিলাম, সেখানে পৌছুবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'রছিল, কান্না পাবে কি?

অসম্ভব ভারী লগেজ সঙ্গে এলো না। কাপড় চোপড় যতদূর সংগ্রহ হ'য়েছিল তা গায়েই স্থান পেয়েছিল। একখানা বাড়তি কাপড় আর খান কয়েক ছোট বই শুধু গামছায় জড়িয়ে বগলে ফেলে আমি হন্ হন্ ক'রে মামার সঙ্গে হেঁটে চ'ল্লাম মেঠো রাস্তা দিয়ে।

[২]

তাক লেগে গেল।

এ কি ক'লকাতা না ইন্দ্রপুরী!

অবাক হ'য়ে শুধু চেয়ে রইলাম।

মামা হিড় হিড় ক'রে টেনে আমাকে নিয়ে ট্রামে চেপে ব'সলেন। আশ্চর্য্য জিনিষ! চাকার উপর ঘর—হড়হড়্ ক'রে চ'লেছে আপনি! —কেউ টেনে নেয় না।

চার দিকে কতকগুলো গাড়ী চ'লছে—ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী—আর কতকগুলো তার ঘোড়াও নেই, গরুও নেই—আপনি চলে!

কি লোক! বাপ! এত লোক এক সঙ্গে থাকে!

এমনি দেখতে দেখতে হাঁ ক'রে চেয়ে চেয়ে চল্লাম।

যেখানে মামা আমায় টেনে নামালেন সে জায়গাটার নাম ভবানীপুর।

ট্রাম থেকে নেবে চক্রবেড়ের রাস্তা দিয়ে খানিকটা দূর গিয়ে মামা একটা ঘরের দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালেন আমাকে নিয়ে।

তখনও আমার নেশার ঘোর কাটে নি। চার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছি। গাঁয়ের মত কিছু নয়।

দেখতে দেখতে, একটু তফাতে দেখতে পেলাম একটা পানা পুকুর, তার ধারে কয়েকটা নারকেল গাছ। জলে নেমে মেয়েছেলেরা স্নান ক'রছে। যেন হাঁপ ছাড়লো। ঠিক আমাদের গাঁয়ের মত।

বিশ পঁচিশ বছরের আগের কথা বলছি—তখনও ভবানীপুর অনেকটা পাড়াগাঁয়ের মত ছিল। পুকুর টুকুর চার ধারেই দেখা যেত।

মামার দিকে নজর ছিল না। যখন ফিরে চাইলাম তখন দেখলাম মামা ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর জামা-টামা খুলে' ব'সেছেন, আর বছর কুড়ি-বাইশের একটা কালো কুৎসিৎ মেয়ে তাঁকে হাওয়া ক'রছে।

মনের ভিতর হঠাৎ যেন একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগলো। এই খানে থাকতে হবে?

মামাকে আমরা একটা কেষ্ট বিষ্টু ব'লে জানি। রাস্তায় আসতে আসতে কত সব বড় বড় বাড়ী দেখেছি, ভাল বাড়ী দেখলেই মনে হ'য়েছে, এইটা বুঝি মামার বাড়ী, এইখানে বুঝি থাকবো!—

মামার বিস্তীর্ণ প্রাসাদে গিয়ে ওঠবার স্বপ্ন দেখছিলাম। তার পর এই?—

একটা খোলার চালার বস্তি, তার ভিতর ছোট্ট একখানা ঘর—আমাদের যে কুঁড়েটুকু দেশে আছে তারও সিকিখানা হ'বে। খোলার চালা, ছিটে বেড়ার দেয়াল, কাঁচা মেঝে। রাস্তার উপর একটা রোয়াক, সেটা বাঁধান। সেদিকে একটা দরজা আর তার

পাশেই হাতখানেক লম্বা ছোট্ট একটা জানালা। অপর দিকে একটা দরজা, তার পর বারান্দা—সেইখানে রান্না হয়। তার পর ছোট্ট একটা উঠান।

এই ঘরে লোকে বাস করে কেমন ক'রে? আমার তো ভাবতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো!

কিন্তু তার চেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ এই যে ধপ্ ক'রে মামা আমার একেবারে স্বর্গলোক থেকে নেমে নিতান্ত ছোট্ট একটা সাধারণ মানুষ হ'য়ে গেলেন। এই ধাক্কাটাই সামলাতে আমার সময় গেল।

যে মেয়েটি ঘরে ছিল, তার নাম শুনলাম বিমলা ওরফে বিমলি। মানুষের চেহারার মধ্যে যতটা ময়লা থাকতে পারে তা' তার আছে— তবু সে বিমলা। মুখ দেখলে বমি আসে; রং কুচ-কুচে কালো, কিন্তু দেহখানা নিটোল, গোলগাল—গড়ন পিটন নেহাৎ মন্দ নয়।

মামা আসতেই মেয়েটা খুব ব্যস্ত হ'য়ে ঘর বার ক'রে তাঁর জন্য রান্না-বান্নার জোগাড় টোগাড় ক'রতে লাগলো। পাখাটা মামা তার হাত থেকে নিয়ে আমার হাতে দিলেন।

আমি বাতাস করতে লাগলাম। এ ক'দিনই মামার কত সেবা ক'রেছি—তাতে মনে গর্ব্ব ছিল কত! কিন্তু আজ বাধ বাধ ঠেকছিল। আমার স্বপ্নের রাজা আজ হ'য়ে গেছে—শুধু গোবর—সেবায় মন ব'সবে কেমন ক'রে?

বাতাস ক'রতে লাগলাম। বিমলি তখন ঘর বাহির ক'রছে! একবার সে বাইরে গেছে, তখন আমি ফুস ক'রে মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "ও কে মামা?"

মামা একটু লজ্জিত ভাবে হেসে ব'ল্লেন, "ও—তোমার মামী।"

বিমলী ঘরে এসে প'ড়লো—মামা তার অপ্রস্তুত ভাবটা চাপা দেবার জন্য তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি অন্য কথা কইতে আরম্ভ ক'রলেন।

আমার গা'টা যেন বিষিয়ে উঠলো। মনে হ'ল দেশে মামীমার কথা—তার অপরূপ রূপরাশি চ'খে ভেসে উঠলো। ভেসে উঠলো তার বিদায়-কাতর করুণ অশ্রুপূর্ণ মুখখানা। বুকের ভিতর যেন মোচড় দিয়ে উঠলো!

এই—মামী মা।

মামা ব'ললেন, "দেখিস খবরদার, দেশে যেন এর কথা কাউকে বলিস না।"

তখনও সবটা জানি নি—কিন্তু জানতে বেশী দেরী হয় নি। ভগবান রক্ষা ক'রেছেন বিমলি সত্যি সত্যিই আমার মামী মা নয়—মামা তাকে বিয়ে করেন নি। তবু রক্ষে—নইলে এ যদি সত্যি সত্যি মামীমা হ'ত তবে বোধহয় আমি ঘেন্নায় ম'রে যেতুম।

যখন সব শুনলাম তখন মনে হ'ল, ধন্যি রুচি মামার। অমন সুন্দর স্ত্রী তার, তার গুণের ব্যাখ্যানা গাঁ ময়!—সে সঙ্গে আসবার জন্য কি কান্নাটা কাঁদলে, তাতে মন উঠলো না—এই আঁস্তাকুড়েই তাকে মরতে হবে। ভাবতে আমার গা বমি বমি ক'রতে লাগলো।

আরও শুনলাম যে বিমলি জাতে খুব ছোটো—জাতের ঠিকও বোধ হয় নেই। কিন্তু তবু এতদিন বিমলি রেঁধেছে, আর মামা অম্লান বদনে তাই খেয়েছেন। কথাটা শুনে আমার নবজাত

ব্রাহ্মণত্ব একেবারে পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো। মা গো, বামুনের ছেলে হ'য়ে কেমন ক'রে অজাতের হাতে খায়?

ভাগ্যে আমার সে দুর্গতি হয় নি।

বিমলির নাকি দু'দিন থেকে শরীর ভাল নেই। আগুনের আঁচ সওয়াটা তার নাকি বারণ। তাই—

মামা ব'ল্লেন, "না, না তোমায় রান্না ক'রতে হ'বে না। যাও তো বাবা বটুক, তাড়াতাড়ি নেয়ে এসে দুটো ভাত চড়িয়ে দেও। আবার এখুনি আফিস যেতে হবে।"

দেখা গেল বিমলির এ আগুনের আঁচ না সওয়া রোগ বেশ স্থায়ী। শুধু তাই নয়, আমি আসবার পর থেকে তার যেন নড়া চড়াও সইছিল না। সে বেশীর ভাগ বিছানায় গড়িয়ে প'ড়ে থাকে, না হয় উঠে দুটো গল্পগুজব করে। তা ছাড়া হাত পা নেড়ে কুটোটাও সরিয়ে ফেলে না।

রান্নায় আমার আপত্তি ছিল না। কেন না ওই অজাত মেয়েটার হাতে খাব এমন প্রবৃত্তি আমার ছিল না। রান্নাটা একরকম জানাও ছিল—আর বিমলির শিক্ষায় দু'চার দিনের মধ্যেই বেশ রপ্ত হ'য়ে গেল। কিন্তু—

রান্না হ'য়ে গেলে সেদিন মামা আমার হাতে দুটো বালতী দিয়ে ব'ল্লেন, "যা'তো বাবা, দু' বালতী জল নিয়ে আয়, স্নানটা ক'রে ফেলি।"

রাস্তার অপর পারে, খানিকটা তফাতে সরকারী কল থেকে জল আনতে হবে।

সেখানে গিয়ে দেখি বেজায় ভীড়। একটি মেয়ে কলে দাঁড়িয়ে বালতী ক'রে জল ভরছে আর চারদিক কেউ কলসী, কেউ বালতী, কেউ আর কিছু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা কাঁধে গামছা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, নাইবে ব'লে। কেউ বা দাঁতন ক'রছে, বা দাঁত মাজছে, মুখ ধোবে ব'লে।

মেয়েটির জল ভরা হ'তেই আমি কলের ধারে এগিয়ে গেলাম। একটা হিন্দুস্থানী লোক "ধেৎ" ব'লে আমায় ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিয়ে একটা ক্যানেস্তারায় জল ভ'রতে ভ'রতে আমাকে অযথা ব'কতে লাগলো। আমি ধাক্কা খেয়ে প'ড়তে প'ড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটি মেয়ে আমাকে ধ'রলে।

যে মেয়েটি আমায় ধ'রলে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লে, "আহা! লেগেছে তোমার?"

আমি ভারী গলায় ব'ল্লাম, "না!" আমার কান্না পাচ্ছিল অপমানে।

হিন্দুস্থানীটা তখন বকর্ বকর্ ক'রে আমায় বকছে। মেয়েটি হাসতে হাসতে তাকে ব'ল্লে—"আরে বকর্ বকর্ করতা কেন? জল ভরছিস্ ভরে নিয়ে যা না। ছেলে মানুষ, জানে না, গেছে তাই হ'য়েছে কি?"

তার পর সে আমায় ব'ল্লে, "তুমি কোথায় থাক!"

আমি মামার ঘর দেখিয়ে দিলাম।

মেয়েটি ব'ল্লে, "ও, ওই বামুনের ঘরে? তুমি বুঝি নতুন এয়েছ?"

"আজ এসেছি!"

মামা রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে একবার আমাকে দেখে ডাকলেন, “ওরে বটুক, পালিয়ে আয়। ওখানে যে ভীড়, কলের জল আর আজ হবে না। দৌড়ে যা’ ওই পুকুর থেকে দু’বালতি জল নিয়ে আয়।”

আমি চ’ল্লাম। যাবার সময় মেয়েটির দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। সেও আমার দিকে চেয়ে রইল।

তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, সুন্দর ব’লে সে আমার চেয়ে দেখছে—মেয়েরা আমাকে দেখে প্রায় অমনি চায়, কত মেয়ে আমায় কোলে টেনে নিয়ে আদর করে। তাই বুঝলাম। বেশ আনন্দ হ’ল।

তার পর আমি যাবার সময় শুনতে পেলাম, মেয়েটি আর একজনকে বলছে, “কি সুন্দর ছেলেটি, ভারী ভালবাসতে ইচ্ছে করে ?”

আমার অন্তর নৃত্য ক’রে উঠলো। নিজের রূপের কথা শুনতে আমার বরাবরই খুব ভাল লাগে।

সেও বেশ সুন্দরী। বয়েস বেশী হবে না, জোর পোনেরো ষোল। কিন্তু কূলে কূলে যেন তার রূপ ভ’রে উঠেছে। দিব্যি পুষ্ট সুস্থ মূর্ত্তি রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু ভারী মিঠে। চোখ দুটি জল জল ক’রছে—ভারী চক্‌চকে। আর মুখখানা ভারী মিষ্টি।

মেয়েটির নাম পরে শুনেছিলাম—মালতী। সে থাকে রাস্তার ওপারে।

*　　*　　*　　*

এমনি দিন চ'লতে লাগলো। রান্না করি, বাসন মাজি, জল তুলি, ঘর ধুই, মামার গা হাত পা টিপি, তামাক সাজি আর ফরমায়েস খাটি।

প্রথম প্রথম গায় লাগে নি। পাড়াগাঁয়ের গরীবের ছেলে, খাটুনী গায় লাগবার কথা নয়। যতই দিন যেতে লাগলো ততই খাটুনী বাড়তে লাগলো। মামা কোনও দিনই কলতলায় স্নান করেন না, জল তুলে আনতো বিমলি, এখন আনি আমি। ক্রমে বিমলিও কলতলায় বা পুকুরে যাওয়া ছেড়ে দিলে—তার বড্ড অসুখ কিনা—আর হাতের গোড়ায় আমি যখন আছিই।

মামা কোনও একটা রাজা উজীর মারা কাজ করেন না, এ কথাটা প্রথম দিনেই আঁচ ক'রেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম তিনি মাইনা পান মোটে তিরিশ টাকা—প্রেসের কম্পোজিটার তিনি—তখন আমার মনটা কেন যেন দমে গেল। সেই তিরিশ টাকার উপর ওভার টাইম ক'রে, চুরী চামারী ক'রে তিনি যা রোজগার ক'রেন তাতে যে দেশে গিয়ে অতটা চাল কেমন ক'রে ক'রতেন তা' ভেবে আমি এখনও অবাক হই।

আটটার সময় খেয়ে দেয়ে মামা আফিস বেরোন। কাজেই খুব ভোরে উঠে আমার রান্নার যোগাড় ক'রে কলতলায় যেতে হয়। কলে জল আসবার আগেই আমি সেখানে বালতী দুটো রেখে আসি—দাবী রাখবার জন্য। কেন না ক'লকাতার কলতলার আইন হ'চ্ছে এই, যে-যে যেমন আসবে তার তেমনি পালা হবে। আইন তাই, তবু দাবী দাওয়া নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি তর্কাতর্কি,

আর মাঝে মাঝে মারামারি, লেগেই আছে। এক দঙ্গল মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে রোজ হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি ক'রে জল তুলে নিয়ে আসি। রান্না চড়িয়ে আবার জল আনি। তারপর রান্না হ'লে মামার স্নানের জল আনি। মামাকে ভাত বেড়ে দি। তিনি খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলে, তাঁর এটো বাসন মেজে তুলি। বিমলি তখনও প'ড়ে ঘুমোয়!

আমি ঘর দোর গুছিয়ে একটু ব'সতে না ব'সতে বিমলি উঠে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে বেরিয়ে আসে। তার পর থেকে বিমলির ফরমায়েস চলে।

বাজারে অন্ততঃ দিনের ভিতর পাঁচ সাতবার যেতে হয়। বিমলির স্নানের জল তুলতে হয়, তার খাওয়া দাওয়ার পর সে দয়া ক'রে নিজের বাসন নিজেই ধোয় তার পর একটু বেরিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে গল্পগুজব করে আসে। সেই সময় আমি হেঁসেল সারি, খাই দাই, বাসন মাজি।

তার পর সে শোয় আমাকে তার গা হাত পা টিপ্‌তে বলে। প্রথমে অস্বীকার ক'রেছিলাম; কিন্তু একদিন মামার কাছে হু-ঘা' খেয়ে বুঝলাম, আপত্তি চ'লবেনা। তার পর বিমলি ঘুমায়। তখন আমার ছুটি।

বিকেল বেলায় আবার খাটুনীর পালা। কাজ আমার শেষ হয় রাত্রি এগারোটায়, যখন মামা ঘুমোন। তারপর আমি বাইরে রোয়াকের উপর গিয়ে শুয়ে থাকি। বিমলি কষ্ট ক'রে উঠে দোরটা বন্ধ ক'রে দেয়।

এ সব কাজ যে আমি খুব মনের আনন্দে ক'রতাম তা নয়।

অনেক কাজই ক'রতে আমার ঘেন্না হ'ত, বিশেষ ঐ বিমলিটার কেটকেটানির জন্যে।

ওকে আমি প্রথম থেকেই বিষচক্ষে দেখেছিলাম। যখন বুঝলাম যে আমার দেবীর মত মামীমার দাম্পত্য অধিকারের শাঁসটুকু ভোগ করে এই মর্কটী, তখন তার উপর আমার একটা বিজাতীয় ক্রোধ হ'ল। আর এই ছোট লোকের মেয়ে যে আমার উপর মামীগিরী ফলিয়ে হুকুম করে এটা আমার কিছুতেই বরদাস্ত হ'ত না। বিদ্রোহ গোড়ায় গোড়ায় প্রায় ক'রতাম। মামার কাছে নির্দ্দয় প্রহার খেয়ে সে বিদ্রোহ ক্রমে লোপ পেয়ে গেল। বিদ্রোহ গেল, কিন্তু শাস্তিটা স্থায়ী হ'য়ে বাহাল রইল।

আমার সুন্দর চেহারা দেখে সবাই—বিশেষ মেয়ে-ছেলেরা আমাকে ভালবাসে। এইটাই ছিল আমার অভ্যস্ত, এবং সবার কাছে এই ভালবাসার সহজ দাবী করাটাই আমার স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এই একটি মেয়ে দেখলাম যাকে আমার সুকুমার সৌন্দর্য্য মোটেই অভিভূত ক'রতে পারে নি। বিমলির মনটা গোড়া থেকেই আমার উপর বিগড়ে ছিল, আমার বিদ্রোহের ফলে সে হ'য়ে উঠলো আমার দারুণ শত্রু। তার ক্যাট্ ক্যাট্ ঘ্যান ঘ্যান আমার উপর দিন রাত লেগেই থাকতো। আমার কোনও কাজই তার মনঃপুত হ'ত না, কেবলই সে খুঁত গালতো। ছেলে মানুষ, অত সইবে কেন? তাই আমি মাঝে মাঝে চড়া রকম জবাব দিতাম। সে উল্টে, লোহা, কাঠ, ইট-পাটকেল যা পেত তাই দিয়ে আমাকে ঠেঙ্গাত। মাঝে মাঝে আমি পালিয়ে এড়িয়ে যেতাম।

কিন্তু সেদিন মামা ফিরে এলে বিমলি তাঁর কাছে লাগিয়ে আমার পাওনা গণ্ডা স্থদে আসলে বুঝিয়ে দিত।

কলতলায় মালতীর সঙ্গে আমার প্রায় দেখা হ'ত, কিন্তু কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু হ'ত না। আমার উপর মামা ও বিমলির অত্যাচার পাড়ার কারও অবিদিত ছিল না, ওপার থেকে মালতীরাও প্রায় দাঁড়িয়ে আমার ছুরবস্থা দেখতো। ছু'একদিন প্রতিবেশী কেউ এসে আমার হ'য়ে মামাকে ছু'একটা কথা বলতো। তাতে কিন্তু ফল খুব ভাল হ'ত না।

একদিন খুব ছু-ঘা' খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কলতলায় গিয়েছি। মালতী তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

সে ব'ল্লে "আহা! ছুধের ছেলে।—এর কি হেনস্তা ক'রেছে দেখ। তোমার মামাটা কি চামার?" তার চোখের কোলটা একটু চক্ চক্ ক'রছিল।

তার করুণায় আমার তপ্ত-হৃদয় শীতল, স্নিগ্ধ হ'য়ে গেল।

[৩]

মামা আমাকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রবেন ব'লে মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সে বিষয়ে তাঁর গরজের কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না।

মাস খানেক কেটে গেলে আমি ব'ল্লাম, "মামা, আমি প'ড়বো না? ইস্কুলে যাব না?"

মামা ভ্রূকুটি ক'রে ব'ল্লেন, "এঃ ইস্কুলে প'ড়বেন? ইস্কুল অমনি সস্তা। ক'লকেতার ইস্কুলে প'ড়তে কত খরচ জানিস?"

মামীমার সঙ্গে কথায় মামার যে যুক্তিবল দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম, এখন ঠিক সেই রকমের যুক্তি শুনে মনটা খুব মুগ্ধ হ'য়ে উঠলো না। মন ভারী খারাপ হ'য়ে গেল।

পড়াশুনায় আমি মন্দ ছিলাম না—কিন্তু পড়বার জন্যে বা ইস্কুলে যাবার জন্যে আমার যে খুব বেশী আগ্রহ ছিল তা নয়। ঢাকের বাজনা সবচেয়ে মিষ্টি লাগে থামলে। তেমনি ইস্কুল আমার সব চেয়ে ভাল লাগতো ছুটি হ'লে। যে দিন ছুটি হ'ত হৈ হৈ ক'রে আনন্দ ক'রে বাড়ী ফিরে আসতাম—যেন খাঁচার পাখী ছাড়া পেয়েছে।

কিন্তু এখন ইস্কুল ছেড়ে এসে এই মাস খানেক শুধু চাকরের

কাজ ক'রে আমার কাছে ইস্কুলে পড়াটা ভারী মিষ্টি হ'য়ে উঠেছিল। এখন আমার প্রায় মনে হ'ত ইস্কুলের কথা—সেখানে যে কত আনন্দ পেয়েছি সেই সব এক দুর্লভ স্বপ্নের মত মনে হ'য়ে প্রাণটা কেঁদে উঠতো—ভারী ইচ্ছা হ'ত স্কুলে ফিরে যেতে। যতই দিন যেতে লাগলো ততই আমার বঞ্চিত হৃদয়ের মধ্যে শিক্ষার জন্য একটা দারুণ বুভুক্ষা জেগে উঠতে লাগলো। দিন যায়, মামা ইস্কুলে পাঠাবার নামটি করেন না দেখে মনে ভয় হ'ল—তাই মামাকে জিগ্‌গেস ক'রে ফেল্লাম।

উত্তর শুনে আমার মনটা একদম ব'সে গেল।

মামা ব'লে গেলেন, "আর কিই বা হবে ইস্কুলে গেলে? যা বুদ্ধি তোর তাতে কিছু দশটা পাঁচটা পাশ ক'রে বসবি না। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে কিই বা মাথা কিনবি? এই দেখ আমি—ফোর্থ ক্ল্যাশ পর্য্যন্ত প'ড়েছি। তবু—দেখছিস তো, ক'রে খাচ্ছি। আর আমাদেরই প্রেসে বি, এ, পাশ বাবুরা বিশ টাকার প্রুফরিডারী চাকরীর জন্যে ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে? ঝাঁটা মার লেখাপড়ার মুখে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে মাতুল মশায়ের এই সুস্থ অভিমত ভাগ্যে স্যাড্‌লার কমিশনের নজরে পড়ে নি। নইলে তাঁরা নিশ্চয় এঁকে টেনে নিয়ে যেতেন সাক্ষী দিতে।

বস্—আমার সব আশা নির্ম্মল হ'য়ে গেল। মা অনেক আশা ক'রে আমায় ক'লকাতায় পাঠিয়েছিলেন, লেখাপড়া শিখে মানুষ হব ব'লে। আমি যদিও ক'লকাতা আসবার নেশাতেই বেশী

অভিভূত হ'য়েছিলাম, তবু আমারও মনে মনে লেখাপড়া শিখে বড় লোক হবার একটা প্রকাণ্ড আশা নিয়েই বাড়ী থেকে এসেছিলাম।

কিন্তু এখন আমার চোখের সামনে জীবনটা বিস্তৃত হ'য়ে গেল একটা ধূ ধূ মরুভূমির মত—চিরদিন শুধু এমনি—বিমলির গোলামী ক'রেই তবে আমার কাটাতে হ'বে। মানুষ হ'বার কোনও আশাই আমার নেই। বিমলি বা মামা যে অমর নন, তাঁদের ছাড়িয়েও যে একটা ভবিষ্যৎ হ'তে পারে এ সম্ভাবনাটা তখন মনে আসে নি।

শিক্ষা লাভের আশায় এমনি পরিপূর্ণরূপে বঞ্চিত হ'য়ে আমার ভিতর বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষাটা বাধা পাওয়া নদীর মত অসহনীয় বেগে গর্জ্জন ক'রে উঠলো।

সেই তীব্র ক্ষুধা মেটাবার মত উপকরণ আমার ছিল না, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি সে সুযোগে একেবারে বঞ্চিত হই নি।

মামা ছিলেন কম্পোজিটার। পড়াশুনার সঙ্গে তাঁর বড় বেশী আত্মীয়তা ছিল না। তবু ছাপাখানায় যে সব বই ছাপা হ'ত তার একখানা ক'রে তিনি প্রায়ই নিয়ে আসতেন—বিশেষ ক'রে যে গুলো তিনি নিজে কম্পোজ ক'রতেন। তাঁর নিজের হাতের কম্পোজ করা জায়গাগুলো খুলে প'ড়তে তাঁর একটা বিচিত্র রকম গর্ব্ব ও আনন্দ ছিল—সেটা অনেকটা লেখকের আনন্দের মত, সৃষ্টির গর্ব্ব ও আনন্দ। আর ঘুমোবার সময় একখানা বই হাতে নিয়ে না শুলে তাঁর ঘুম হ'ত না।

মামার এই ঘুমের ঔষধগুলির উপর আমার দারুণ লোভ পড়ে

গেল। লেখাপড়া করবার ব্যাহত উগ্র আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর আমার ভিতর তৃপ্তির সন্ধান করতো—আর যেখানে যা পেতাম তাই প'ড়ে আমি একটা অসাধারণ আনন্দ পেতাম। খবরের কাগজের টুকরো বা ঠোঙ্গায় ক'রে মুদীর দোকান থেকে জিনিষ আনলে, জিনিষটা ঢেলে রেখে কাগজখানা পাট ক'রে ব'সে প'ড়তাম।

প্রথম প্রথম মামার বইগুলিতে হাত দিতে সাহস হ'ত না। তার পর ক্রমে এক আধখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে ভরসা হ'ল। শেষে বই নিয়ে রীতিমত প'ড়তে লাগলাম। বইগুলি ছোঁবার বিষয়ে আমার গোড়ায় যে অহেতুক ভয় ছিল সেটা যে নিতান্ত অমূলক নয় তা তখন টের পেলাম।

বিমলির গুণাবলীর মধ্যে অক্ষর পরিচয়ের কোনও স্থান ছিল না। কিন্তু বইগুলির উপর তার বিশেষ যত্ন ছিল। সেগুলি সে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখতো একটা কুলুঙ্গী গোছ ক'রে তার উপর। সেখান থেকে আমি যখন বই নাড়া চাড়া আরম্ভ ক'রলাম, তখন প্রথমে সে টের পায় নি। কিন্তু যখন টের পেল তখন তার হস্ত ও রসনা সমান চঞ্চল হ'য়ে আমাকে ব্যথাতুর ক'রে তুললো।

মামার এত যত্নের বই—তাঁর নিজের হাতের তৈরী বইগুলো—আমি এমনি ক'রে নষ্ট ক'রতে সাহস করি—এ ধৃষ্টতায় যে সে কতখানি অবাক হ'য়েছে তাই সে যথেষ্ট বাক্‌বাহুল্যের সঙ্গে প্রকাশ ক'রলে। তার পর লেখাপড়া সম্বন্ধে সাধারণভাবে সে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ ক'রলে সে কথা কাগজে লিখে পাঠালে স্কুল

কলেজ ভাঙ্গবার জন্য যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের বিশেষ উপকারে লাগতো।

"ন্যাকা পড়া—ন্যাকা পড়া শিখে তো চোদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রবেন! কাজ একখানা ক'রতে বল—তার নামটি নেই—বাবু ক'রবেন ন্যাকা-পড়া। ন্যাকাপড়া ক'রে জজ্ মাজিষ্টর হবেন—উকীল হবেন—হাতী হবেন, ঘোড়া হবেন! দেখ্ গে তোর মামাকে। কখানা বই প'ড়েছে?—কি ন্যাকাপড়া শিখেছে?—রোজগার ক'রে খাচ্ছে! আর তুই ন্যাকাপড়া করে মাথা কিনবি! রেখে দে বই—রেখে দে। ফের যদি বই ছুঁয়েছিস কি মাথাটি ভেঙ্গে মুড়িঘণ্ট বানিয়ে দেব।—বুঝে রাখিস।"

মাথা মুড়িঘণ্ট হ'তে বেশী বাকী ছিল না! অনেকগুলি ঘা পড়েছিল তার উপর, নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে ঠোকা-খাওয়া শক্ত খুলি না হ'লে হয় তো গুড়ো হ'য়ে যেত।

তবু লোভ ছাড়তে পারলাম না। বিশেষ, মারটা এখন খুব গা' সওয়া হ'য়ে উঠেছিল। কিলটা চাপড়টা নিত্য নৈমিত্তিক হ'য়ে গিয়েছিল, লাঠি সোটা ইটপাটকেলও এখন হজম ক'রতে বেশী সময় লাগতো না।

কাজেই বিমলির এই যক্ষের ভাণ্ডারের উপর চুরী ডাকাতি চালাতে লাগলাম। বিমলি যখন দিনের বেলায় ঘুমায় তখন বই নিয়ে আমি গোপন জায়গায় গিয়ে পড়ি। রাত্তিরে বেরিয়ে আসবার সময় এক আধখানা বই সরিয়ে নিয়ে আসি, রাস্তার গ্যাসের আলোতে ব'সে পড়ি। এমনি ক'রে পড়ি। বিমলি

কখনও কখনও জেগে উঠে আমার চুরী টের পায়। তখন সে গরু-খোঁজা ক'রে আমার গোপন গহ্বর থেকে আমায় টেনে হিড় হিড় ক'রে নিয়ে এসে ঠেঙ্গায়।

এমনি ক'রে আমি ক্রমে অনেক বই প'ড়ে ফেললাম। মামার বই-গুলো ছিল এক বিচিত্র সংগ্রহ! কোনও ইস্কুলের কর্ত্তা কোনও দিন ছাত্রদের জন্য এমন অপূর্ব্ব পাঠ্য তালিকা ক'রবেন না। সে সব বইয়ের ভিতর ছিল রামায়ণ, ডাইরেক্টারী পঞ্জিকা, মহাভারত, টোটকা সংগ্রহ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ডিটেক্টিভ উপন্যাস, গুপ্তকথা, ছেলেদের রূপকথার বই, থিয়েটার সঙ্গীত, নাটক, প্রহসন,—আবার ছিল বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, দুইখানা বিজ্ঞান পাঠ, আর উপনিষদের অনুবাদ। কোনও কিছুই আমি বাদ দিই নি। বুঝি আর না বুঝি প'ড়তাম সব।

ক'লকাতায় আসবার বছর খানেক পর একদিন অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড নামে একটা লোমহর্ষণ ডিটেক্টিভ উপন্যাস নিয়ে আমি লুকোবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে চ'লে গেলাম রাস্তার ওপারে। ওপারে আমাদের ঘর থেকে একটু দূরে একটা বস্তি ছিল, তার পাশে একটা খুব সরু গলি। সেই গলির মুখে কয়েকটি মেয়ে রোজ সন্ধ্যা-বেলায় সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে থাকতো। আমি জানতাম না ওরা কে, আর কেনই বা দাঁড়ায়। ওদের বিষয়ে আমার আগ্রহও এত কম ছিল যে আমি জানবার কোনও চেষ্টাও কোনও দিন করে নি। মাঝে মাঝে, কালে ভদ্রে দেখতাম মালতীও এসে ওদের সঙ্গে দাঁড়াত। মালতীর ঘর বোধ হয় ঐ গলিরই ভিতর কোথাও।

বিমলি ঘুমালে পর আমি বইখানা হাতে ক'রে সাঁ ক'রে ঢুকে প'ড়লাম এই গলির ভিতর। দেখলাম লোকজন কেউ নেই। গলির এক পাশে একখানা পাকা বাড়ী, একটা হোটেল। আর এক পাশে খোলার চালের বস্তি। একটু দূরে গিয়ে গলিটা একটু মোচড় ঘুরে গেছে। সেটা ঘুরে দেখলাম দিব্যি নিরিবিলি একটা জায়গা। পাকা বাড়ীর একটা বন্ধ জানালার ফাঁকে কষ্টেসৃষ্টে একটু বসবার জায়গা হয়। এখানে ব'সলে, গলির এপার ওপার, কোথাও থেকে দেখা যায় না! জায়গাটা অসম্ভব নোংরা,—কিন্তু এই কোণাটা আবার ময়লা জমা করবার জায়গা! একটা নর্দ্দামা আছে জানালার তলায় সেটাও মোটেই পরিষ্কার নয়।

এই অপূর্ব্ব স্থানে সরস্বতীর পদ্মাসন রচনা ক'রে আমি ব'সে গেলাম প'ড়তে।

বইখানা প'ড়তে গা যেন রী রী ক'রতে লাগলো। পাতায় পাতায় তার লোমহর্ষণ কাণ্ড—ছত্রে ছত্রে অদ্ভুত উপায়ে সব বিপদ নায়কের উপর ঘনীভূত হচ্ছে—অক্ষরে অক্ষরে যেন রক্তের নদী ব'য়ে যাচ্ছে। আমি একেবারে তীব্র আগ্রহের সঙ্গে বইখানা প'ড়তে লাগলাম।

প'ড়তে প'ড়তে কখন যে বেলা গড়িয়ে প'ড়েছে দেখতে পাইনি। বাহ্যজ্ঞান আমার ছিলই না। পথ দিয়ে লোকজন—বেশীর ভাগ সামনের বস্তির মেয়েরা—আনাগোনা ক'রতে লেগেছিল, তা' নজরে পড়ে নি। আমি যে জানালাটায় ব'সেছিলাম সে জানালাটা খুলে গেল; শব্দ শুনলাম, কিন্তু তখন বিমলকুমারকে চারজন দস্যু

এসে গলা চেপে, ধ'রেছে—ফিরে চাইতে পারলাম না। তারপর সে জানালার কথা ভুলে গেলাম।

খানিক পরে তার পাশের একটা দরজা খুলে কে একজন বেরিয়ে গেল। তাও দেখলাম না।

তার অনেকক্ষণ পর একজন আমার নাম ধ'রে ডাকলে। আমি মুখ তুলে দেখি মালতী!

গা ধুয়ে গামছা প'রে তার উপর কাপড়খানা আলগা ক'রে গায় জড়িয়ে, দু'হাতে দুটো ছোট বালতী ভ'রে জল নিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে।

মালতী ব'ল্লে "জল তুল্‌লে না আজ?"

চোখ তুলে দেখি বেলা যায় যায়। আর একটু পরেই কল বন্ধ হ'য়ে যাবে—হয় তো জল তুলে সেরেই উঠতে পারবো না।

আমি আমার উচ্চাসন থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ব'ল্লাম, "সর্ব্বনাশ! বেলা যে ব'য়ে গেছে—জল তুলবো কখন?"

মালতী ব'ল্লে, "আমিও তো তাই ভাবছিলুম। এখন কি ক'রবে?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে ব'ল্লুম, "আজ মারের চোটে আর পিঠ আস্ত থাকবে না। বিমলি হয় তো চেলাকাঠ নিয়ে মার মূর্ত্তি হ'য়ে র'য়েছে।"

সেই কল্পনায় ঘরে ফিরতে ভয়ে পা উঠছিল না। মালতী করুণ নয়নে আমার আতঙ্ক-পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে একটু ভেবে ব'ল্লে, এক কাজ কর। এই দু'বালতী জল তুমি ওধার দিয়ে ঘুরে নিয়ে

যাও, যেন কলতলা থেকেই জল নিয়ে ফিরছো। তার পর বালতী দুটো ফিরিয়ে দিয়ে যেও, আমার পুকুরের জল হ'লেই চলবে।"

আমি যেন অকূলে কূল পেলাম। মালতীর হাত থেকে বালতী নিয়ে ঘুরে কলতলার ধারে গিয়ে সেখান থেকে ঘরে গিয়ে উঠলাম। গিয়ে দেখি আমার জোর বরাত, বিমলির ঘুম তখনও ভাঙ্গে নি। তাড়াতড়ি আমার নিজের বালতীতে জল ঢেলে রেখে মালতীকে তার বালতী ঘুরিয়ে দিয়ে এলাম।

রাত্রে বিমলি দোর বন্ধ ক'রলে আমি আবার বইখানা নিয়ে ছুটে গেলাম সেইখানে। সে জায়গা ঠিক একটা গ্যাসের আলোর নীচে, সেখানে ব'সে রাত্তিরে প'ড়তে বেশ স্থবিধা! তাই গেলাম।

তখন গলিতে লোক আনাগোণা ক'রছে। গলির মুখে যে মেয়েগুলো বসে তারা হাসা-হাসি ছুটো-ছুটি ক'রছে। সামনের বস্তিতে আর এ পাশের পাকা বাড়ীতে বেশ সরগরম। মাঝে মাঝে গান বাজনা হ'চ্ছে। আমি যেখানে ব'সে ছিলাম সেই জানালার পারেও ক্রমে একটা হারমোনিয়ম বেজে উঠলো, একটি মেয়ে গান গাইতে আরম্ভ ক'রলে মনে হ'ল মালতী। কিন্তু বিমলকুমারকে ভয়ানক বিপদের মাঝখানে ফেলে উঠে গিয়েছিলাম—বাঘে তাকে খায় খায়—এ সব দিকে নজর দিতে পারলাম না। ব'সে, প'ড়তে লাগলাম।

বইখানা শেষ হ'লে গিয়ে শুলাম। আর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম বিমলকুমারের মত সব ভয়ানক ভয়ানক বিপদের!

পরের দিন দুপুর বেলায় আবার যখন বই হাতে ক'রে সেখানে গিয়েছি তখন দেখি পাশের দোরটা খুলে মালতী দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখেই সে হেসে ব'ল্লে, "ওই! এসোছ। আমি ঠিক ভেবেছি আসবে। আচ্ছা ঠাকুর তুমি এত পড় কি? কোনও পাশ দেবে নাকি?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি ব'ল্লাম, "আমি যদি পাশ দেবো তবে মামার হাঁড়ি ঠেলবে কে?"

"তোমার বুঝি প'ড়ে পাশ দিতে খুব মন চায়? তা' ইস্কুলে গিয়ে পড় না কেন?"

আমার বুক ঠেলে কান্না উঠতে লাগলো। বড় নরম জায়গায় ঘা দিলে মালতী।

আমি ব'ল্লাম, "পড়ায় কে? মামা বলেন—অনেক খরচ।" তার পর একটু থেমে ব'ল্লাম, "অথচ আমাকে লেখাপড়া শেখাবে ব'লে আমার মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। আমি তো তখন জানতাম না মামা এই, আর তার ভাত রাঁধবার লোকের দরকার ব'লে আমাকে এনেছে।"

মালতী ব'ল্লে, "তুমি তবে দেশে ফিরে যাও না কেন? এখানে থেকে এই গাধার মত খেটে আর মার খেয়ে মর কেন মিছে?"

মালতীকে ব'ল্লাম "আমি কত গরীব, মার কি দুঃখ। এ সব কথা শুনলে মা বড্ড কাঁদবেন, তাই তাঁকে জানাই নে। তা' ছাড়া দেশে ফিরেই বা ক'রবো কি? সেখানেও তো লেখাপড়া শিখতে পারবো না।"

মায়ের দুঃখের কথা ব'লতে বলতে আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে' প'ড়তে লাগলো। মালতী আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে

আদর ক'রে চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তার চোখও তখন ছল ছল ক'রছিল।

খানিকক্ষণ পরে সে ব'ল্লে, "তা তুমি ওই নোংরা জায়গাটায় ব'সে পড় কেন?"

"বিমলির ভয়ে। আমার হাতে বই দেখলেই সে আমায় মারতে আসে।"

"আহা, বেচারী! তা' ওখানে ব'সতে হবে না, তুমি এসো আমার ঘরের ভেতর। এখানে কেউ তোমায় খুঁজে পাবে না।"

আমাকে সস্নেহে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে সে দরজায় খিল দিয়ে জানালার কাছে একখানা মাদুর বিছিয়ে আমায় বসালে। তার পর সে আমার পাশে এসে ব'সলো।

এতদিন পর এত আদর পেয়ে আমার মনটা গ'লে গেল। আমার চোখ বার বারই জলে ভ'রে উঠতে লাগলো।

সেদিন অনেকক্ষণ পড়া বেশী কিছু হ'ল না। মালতীর সঙ্গে ব'সে ব'সে কেবল আমার দুঃখের কথা ব'লে গেলাম। আমি কাঁদলাম, মালতীও চোখের জল ফেললো।

শেষে মালতী ব'ল্লে, "তোমার হাতে ও কি বই?" ব'লে সে বই খানা হাতে টেনে নিলে।

দেখলাম মালতী প'ড়তে জানে। সে প'ড়লে, "গল্পগুচ্ছ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বই খানা কেমন?"—

আমি তা জানতাম না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা স্কুলে থাকতে পড়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে আমার সেইটুকু পরিচয়ের জোরে

বল্লাম "তা আমি জানিনে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা পড়েছি সেটা বেশ। আঃ কাল যে বইখানা প'ড়ছিলাম সেটা কিন্তু চমৎকার!" বইখানা ছিল অতিশয় নিকৃষ্ট একখানা তথাকথিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—অমন ভাল বই আমি পড়ি নি।"

পাঁশগাদার মাঝখানে মাণিক কুড়িয়ে পেয়েও আমি তখন তার দাম বুঝতে পারিনি।

মালতী ব'ল্লে, "আচ্ছা পড় তো, শুনি।"

আমি প'ড়তে লাগলাম। গল্পটীর নাম "ছুটি।"

প'ড়তে প'ড়তে আমার ভারি আঠা লেগে গেল। মনে হ'ল যেন আমারই কথা লেখা হ'য়েছে। ফটিক তবু প'ড়তে পেয়েছিল, আমার তো তাও হ'ল না!

নিজের সঙ্গে ফটিকের অবস্থার সাদৃশ্য অনুভব ক'রে আমি খুব দরদের সঙ্গে প'ড়তে লাগলাম। শেষটা যখন ফটিকের শেষ ছুটি হ'ল তখন চোখ জলে ভ'রে গেল, কথাগুলো পড়ে গেলাম কাঁদতে কাঁদতে।

পড়া শেষ ক'রে চোখ মুছে দেখলাম মালতীর চোখেও জল। "আহা, বেচারা!" বলে সে চোখের জল মুছলে।

তার পর সে ব'ল্লে, "এখন যাও। তোমার মামী হয়তো এখন উঠে পড়েছে।"

আমি বল্লাম, "কে মামী? ঐ কালপেঁচা! ওকে মামীমা বলে ডাকতে হয় আমার, কিন্তু নেহাৎ না ঠেকলে ও নাম মুখে আনি না। ওকে ওই বলে ডাকতে আমার গা বমি বমি করে!"

মালতী হেসে বল্ল, "তাই নাকি ?"

আমি বল্লাম, "আমার যে সত্যি মামীমা, সে একেবারে লক্ষ্মীর মত দেখতে। আমার রং দেখছো, আমি তার কাছে কালো। আর কি সুন্দর, আর কি লক্ষ্মী যে কি বলবো। আমি ভাবি অমন বউ থাকতে মামা কেমন করে ওই পেত্নীটা নিয়ে থাকে।"

মালতী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো !

তার পর আমি বেরিয়ে গেলাম। যাবার আগে মালতী একবার দোর খুলে চারদিক দেখে এলো, কেউ কোথাও নেই দেখে হুট্ ক'রে আমায় ঘর থেকে বের ক'রে দিয়ে দোর বন্ধ ক'রলে। জানালায় দাঁড়িয়ে ডেকে ব'ল্লে, "কাল দুপুর বেলায় আবার এসো কিন্তু।"

আমি সোৎসাহে ব'ল্লাম, "নিশ্চয়, আজ রাত্তিরেই আবার আসবো।"

মালতী হেসে ব'ল্লে, "নারে পাগল ছেলে, রাত্তিরে এসো না। রাত্তিরে এ গলির ভিতর তুমি এসো না ; বুঝলে ?"—

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্লাম, "কেন ? কি হবে ?"

মালতী শুধু ব'ল্লে, "আমি বারণ ক'রছি, এসো না। গলির লোকেরা ভাল নয়।"

কথাটায় আমার মনের ভিতর বিমল কুমারের জীবনের অনেকগুলো কথা মনে প'ড়ে গেল। ক'লকতার সব গলির ভিতর তার অনেকবার অনেকরকম অদ্ভুত বিপদে প'ড়তে হ'য়েছিল। প্রাণটা আঁৎকে উঠলো —যদি তেমনি কোনও বিপদ আমার হয়। সে রাত্রে আর সেখানে গেলাম না।

[৪]

কথাটা মালতী খুলে ব'ল্লে কোনও বিশেষ দোষ ছিল না। কেন না সে আমাকে যত কাঁচা ছেলে মনে ক'রেছে তা আমি নই।

তের বছরের ছেলে, নেহাৎ পাড়াগাঁয় থাকলেও, বেশ্যা কথাটা জানি। তারা ঠিক কি করে, তার সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও একটা অস্পষ্ট ধারণা আমার গাঁয় থাকতেই ছিল। তার পর ক'লকেতায় এসে মামার দৌলতে যে সব বই প'ড়তে পেয়েছিলাম তাতেই ধারণাটা অনেক পরিষ্কার হ'য়ে যেত। কিন্তু তা ছাড়া যে পাড়ায় এসেছিলাম তাতে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক-ঘটিত অবৈধ ব্যাপারের সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের অভাব হয় নি।

মামার সঙ্গে বিমলির প্রেম সম্ভাষণের মধ্যে খুব বেশী ঢাকাঢাকি ছিল না। তা ছাড়া আমাদের ঘরের আশে পাশে যে কয়টি লোক সপরিবারে বাস ক'রতো, অল্প দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম যে তাদের পরিবারের মধ্যে কেউই ঠিক বিবাহিতা স্ত্রী নয়। আমাদের ঘরের ঠিক পাশেই একটি এমনি পরিবার থাকতো; তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি হ'লে যে সব কথাবার্ত্তা বাহির থেকে শুনতে পেতাম তাতে জানা যেত যে মেয়েটী গৃহস্থ ঘরের বউ ছিল, কর্ত্তাটি তাকে অবৈধ উপায়ে ঘরের বাহির ক'রেছে। ও পাশে মেঠাইয়ের দোকানে যে ময়রা বাবু থাকেন, রাত্তিরে তিনি

দোকান ঘরেই শোন—তাঁর সঙ্গে যে থাকে সে একটি গুর্খা মেয়ে—কিছুদিন আগে যে থাকতো সে এখন সামনের খোলা ঘরে বাস করে। একটি বেশ বাবু গোছের লোক একটি ঘরে থাকে, লোকটি মুসলমান। তার ঘরে যে মেয়েটি থাকে সে কিন্তু হিন্দু—তিলক কাটে। এমনি সব।

এই সব সম্পর্কের আন্তরিক অবস্থা হয়তো সাদা চোখে আমি আপনিই দেখতে পেতাম, কিন্তু তারও তর সয়নি।

পাড়ায় যে সব লোক থাকতো, তাদের ভিতর মেলা মেশায় বয়সের অন্তরায় বশতঃ কোনও রকম বাধা হ'ত না। আমার সমবয়সী সঙ্গী বড় কেউ ছিল না, আমি মিশতাম ঐ ময়রার দোকানের কারিগরদের সঙ্গে, আর বস্তির যত সব বিশ ত্রিশ বছরের যুবকদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে হাসি তামাসা গল্প সল্প যা হ'ত সে বেশ সমানে সমানে হ'ত। আমি ছেলে মানুষ ব'লে, তারা আমার সঙ্গে কিছু পরদা রেখে কথা কইতো না। তাদের কথাবার্ত্তার ইঙ্গিত আমি সব সময় সম্পূর্ণ বুঝতে পারতাম না। কিন্তু স্পষ্ট কথায় তারা যা ব'লতো তাতেই আমার জ্ঞানের রাজ্য বিপুল প্রসার লাভ ক'রেছিল।

ওধারে বস্তির বেশ্যাদের সঙ্গে আমাদের ঘরের লোকদের খুব বেশী মেশামিশি ছিল না। যাতায়াত ত ছিলই না কিন্তু তাদের প্রতি যে কোনও নীতি বা ধর্ম্ম-ঘটিত বিরাগ কারও ছিল, তা নয়। ঐ মেয়েগুলোর সম্বন্ধে এরা কৌতুক ক'রতো, রাস্তায় বা কলতলায় দেখা হ'লে বেয়ারিং পোষ্টে ইয়ারকী ক'রতে কেউ ছাড়তো না, তারাও রঙ্গ

ক'রে তার উত্তর দিত, গাল দিত, গায় জল ছিটিয়ে দিত, দু' একটা কিল চড়ও দিত। সে সব আমাদের লোকেরা বেশ উপভোগ ক'রতো।

আমিও বয়স ও জ্ঞানের অনুপাতে যতদূর সম্ভব সে সব কৌতুকে গোপনে যোগ দিতাম। এই সব ব্যাপারে শ্লীলতার কোনও বালাই ছিল না। কিন্তু মামা ও বিমলির কাছে আমি যথাসম্ভব ভাল মানুষ সেজে থাকতাম।

মালতীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার তিন চার দিন পরই আমি জানতে পারলাম যে ওই মেয়েগুলি বেশ্যা, এবং মালতীও তাই। তখন মালতীর কথাটা মনে হ'য়ে আমার ভারী কৌতুক বোধ হ'ল। নিজে সে বেশ্যা, অথচ এদেরকে বলে মন্দ লোক! কি অদ্ভুত!

মালতীর কাছে কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলি নি। তার কাছে এ সব কথা পাড়তে আমার বড় সঙ্কোচ হ'ত। সে এমন ভাল, আর আমাকে এত স্নেহ করে যে যখন তার কাছে থাকতাম তখন সে যে বেশ্যা এ কথা আমার মনেই হ'ত না। মনে হ'ত ঠিক যেন আমার বড় বোনটি। তার কাছে আমি খুব ভাল, নিরীহ গোবেচারা হ'য়েই থাকতাম।

সে দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক থাকতেন তিনি মামার কাছে এসে ব'ল্লেন, "চক্রবর্ত্তী ম'শায় এলাহাবাদে দেখে এলাম একটা ভাল চাকরী খালি আছে। —যাবেন? বাঙ্গলা কম্পোজিটার চাই, ষাট টাকা মাইনা, থাকবার ঘর অমনি দেবে। যাওয়া আসার ভাড়া দেবে।"

মামা গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন, "থাকবার ঘর কেমন? ফেমিলি নিয়ে থাকা যায়?"

বিমলি ব'সে পান সাজছিল, সে মুখ তুলে চাইলে!

বাবুটি ব'ল্লেন "কোয়ার্টার ঐ ছাপাখানার মধ্যেই একটা ঘর। অনেক লোকজন থাকে সেখানে।"

"আরে দূর, সেখানে কি মেয়ে ছেলে নিয়ে থাকা যায়? কি বলিস বিমলি?"

বিমলি ব'ল্লে, "বেশ তো চল না? বেশ তীর্থ করাও হ'বে, মাইনেও বেশী।"

"আরে দূর, সে এক দঙ্গল মেড়োর মাঝখানে তুই থাকবি কেমন ক'রে?"

এই 'ফেমিলির জন্য' এত দুশ্চিন্তা! আমার হাঁসি পেল।

বাবুটি এদিক ওদিক চেয়ে মামার বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ব'ল্লেন, "এঃ আপনার দেখছি অনেক বই—ভাল কিছু আছে নাকি?"

গর্ব্বের সঙ্গে মামা ব'ল্লেন, "আছে বই কি? দেখুন না। এ সব আমার নিজের হাতের কাজ।" ব'লে কতকগুলো বই নামিয়ে নিয়ে এলেন।

"এই যে বঙ্কিমের বই দেখছি! এসব আমি প'ড়েছি। আমার এর ভিতর রাজসিংহটাই লাগে ভালো। কি বলেন?"

মামা ব'ল্লেন, "হাঁ তা বেশ, কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের খাতাও মন্দ নয়।"

"বৈকুণ্ঠের খাতা' আবার আছে না কি? সেখানা তো পড়ি নি।"

বলা বাহুল্য বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলীর ভিতর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' পাওয়া গেল না।

মামা ব'ল্লেন, "আমি প'ড়েছিলাম বইখানা আর এক জনের কাছে।"

"বই যদি বলেন, তবে সুরেন ভট্টাচাজের—মিলন মন্দির—কি খাসা বইখানা! বঙ্কিমের বই তার পায় কেটে দেওয়া যায়!"

আমার মুখ নিস্‌পিস্‌ ক'রতে লাগলো—ইচ্ছা হ'ল ব'লে দি "অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের" কথা। কিন্তু চেপে গেলাম।

"আচ্ছা রবি ঠাকুরের বই কিছু আছে?—'চোখের বালি'?

মামা ব'ল্লেন, "ও সব বাজে বই নেই আমার কাছে। রবি ঠাকুর আমার ভাল লাগে না। একখানা কি যেন আছে তার, দেখি।"

মামা খুঁজতে লাগলেন। আমার বুকের ভিতর ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ ক'রতে লাগলো।

"গল্পগুচ্ছ" খানা আমি মালতীর বাড়ীতেই রেখে এসেছি—পাছে শেষে আবার সংগ্রহ ক'রতে না পারি। তাই মামাকে সেই বই খুঁজতে-দেখে প্রাণ আঁৎকে উঠলো।

মামা খানিকক্ষণ সব বই ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে ব'ল্লেন, "হাঁরে বিমলি, সে বইখানা গেল কোথায়? ঐ কি বলে ভাল—'গল্প লহরী'?"

বিমলি পান সেজে মামার আর ঐ বাবুর হাতে দিয়ে ব'ল্লে, "যাবে আবার কোথা? ওখানে নেই?"

"না—গেল কোথায়?"

"তবে ঐ ছোঁড়া নিয়েছে। ওর যে বইয়ের বাতিক—

একখানা বই যদি ঘরে থাকতে দেবে।" ব'লে সে আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। মামা কট্‌মট্‌ ক'রে আমার দিকে চাইলেন, আমি ভড়কে গিয়ে বল্লাম, "আমি নিই নি।"

মামা তেড়ে এসে ব'ল্লেন, "নিশ্চয় নিয়েছিস তুই। কোথায় রেখেছিস বল।"

আমি তাড়াতাড়ি মামার পা ছুঁয়ে ব'ল্লাম "গল্প লহরী" আমি ছুঁইও নি—পৈতে ছুঁয়ে শপথ ক'রলাম। ভাবলাম সত্য শপথই হ'ল। তবু মামা বেশ দুঘা' দিয়ে ছাড়লেন। পাশের ঘরের বাবুটি মাঝখানে পড়ায় প্রহারটা বেশ আটপিঠে' হ'তে পারলো না।

আমার খুব বেশী দুঃখ হ'ল না। বরং মনে হ'ল, বেশ হ'ল। বইখানা এখন আর ফিরিয়ে আনতে হবে না—ও আমারই রইলো। 'ছুটি' গল্পটা প'ড়ে বইখানার উপর আমার কেমন একটা মায়া প'ড়ে গিয়েছিল।

একদিন একটা বুড়ো বইওয়ালা কতকগুলো পুরোণো বই একটা বোঁচকায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। পাশের ঘরের বাবুটি তাকে ডেকে তার বইগুলো সব নেড়ে চেড়ে দেখলেন, দর-দস্তুর ক'রলেন—কিনলেন না একখানাও। আমিও তাঁর পাশে গিয়ে বইগুলো নাড়া চাড়া ক'রে দেখতে লাগলাম। কয়েকখানা ছবিওয়ালা বই দেখে ভারী লোভ হ'ল আমার। আমি সেগুলো প'ড়তে লাগলাম। ইংরাজী বই, সব বুঝতে পারলাম না, তবু খুব আগ্রহ ক'রে প'ড়তে লাগলাম।

বিমলি এসে উঁকি মেরে দেখছিল।

সে বইওয়ালাকে ব'ল্লে, "এ সব বই তুমি বেচ?"

সে ব'ল্লে "হাঁ।"

"কোথায় পাও এ সব?"

"লোকের কাছে কিনি। যার যে বইয়ের দরকার না থাকে সে বেচে।"

বিমলি আমার দিকে একবার চাইলে—আমি টের পেলাম, কিন্তু বইয়ের উপর ঝুঁকে প'ড়ে রইলাম।

বিমলি একটু পরে বইওয়ালাকে ডেকে তার ঘরে নিয়ে গেল। তখন আমি সত্যিই বইয়ের ভিতর নিবিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলাম।

বইওয়ালা বোধহয় মামার বইগুলো তখন নেড়ে চেড়ে দেখছিল। আমি মুখ তুলে দেখি বইয়ের কাছে কেউ নেই।

লোভ সামলাতে পারলাম না। যে বইখানা প'ড়ছিলাম তার নাম, Birds and Beasts——জীবজন্তুর সব কত কথা আছে। চট্ ক'রে সেখানা কাপড়ের তলায় লুকিয়ে সরে' প'ড়লাম—ঘোরা পথ দিয়ে একেবারে মালতীর ঘরে গিয়ে পৌছুলাম।

বিমলি যে বইওয়ালাকে কেন ডেকে নিয়েছিল সেটা আমি তখন ঠিক আঁচ ক'রতে পারি নি। পরে বুঝেছিলাম।

বইওয়ালা আমার চুরী ধ'রতে পারে নি। সে খানিক বাদে চ'লে গেল। বিকেল বেলায় আমি মালতীর ঘর থেকে ফিরে এসে কাজ কর্ম্ম আরম্ভ ক'রে দিলাম।

তার পর বইওয়ালা একদিন দুপুর বেলায় এলো। বিমলি তখন

শুয়েছে, আমি কাজ কর্ম্ম সেরে বেরোবার জোগাড় করছি। বিমলি তাকে দেখেই তড়াক ক'রে উঠে আমায় ব'ল্লে, "যা তো জগুবাবুর বাজার থেকে দুটো পাতি নেবু কিনে নিয়ে আয় ?"

আমি একটু অনিচ্ছার সুরে ব'ল্লাম, "এখন যাব ?"

"হাঁ এক্ষুণি যা, নইলে আবার বিকেলে সময় পাবি নে। যা' বেরো।"

এক রকম ধাক্কা দিয়ে আমায় বের ক'রে দিলে। আমি গজ্ গজ্ ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে গেলাম। ভারী রাগ হ'ল। খানিক দূর গিয়ে ফিরলাম। একটু ঘোরা পথ দিয়ে মালতীর বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লাম।

মালতী তখন শুয়ে পড়েছে। আমি যেতেই দোর খুলে দিলে। দোর বন্ধ ক'রে আমি মাদুর পেতে ব'সে প'ড়তে লাগলাম, মালতী পাশেই শুয়ে গড়াতে লাগলো।

সেদিন যে গল্পটা প'ড়লাম তার নাম "কাবলীওয়ালা"। আমার কিছু ভাল লাগলো না। এ কী একটা গল্প? তার পর পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখলাম "শাস্তি"। প'ড়তে লাগলাম, খুব ভাল লাগলো। একেবারে নিবিষ্ট হ'য়ে প'ড়লাম। মনে মনে আশা ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত সব কথা প্রকাশ হ'য়ে যাবে আর হাকিম খুসী হ'য়ে সবাইকে ছেড়ে দেবেন। ও হরি, শেষ কালে কি না ওই নির্দ্দোষ বউটার ফাঁসি হ'য়ে গেল! ভারী রাগ হ'ল আমার।

মালতীর দিকে চেয়ে ব'ল্লাম, "কি অন্যায় বল তো ?"

—কারে বলি, কেবা শোনে? মালতী তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

তার পর আর দু'চারটে গল্প প'ড়ে সেদিনকার মত বিদায় হ'লাম।

কয়েক দিন পর মামার হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে কুলুঙ্গীর উপর বইগুলো অনেক কমে গেছে।

মামা ব'ল্লেন "হাঁরে, বই গেল কোথা?"

আমি চেয়ে দেখে একেবারে নির্ব্বাক হ'য়ে গেলাম। "তাই তো, বই গেল কোথা?"

বিমলি ব'ল্লে—"যাবে আর কোথা? নিয়ে থাকলে ওই নিয়েছে।"

বড্ড ভয় হ'ল। মামা নিশ্চয় ভাববেন আমি নিয়েছি। এবারে আর আমার শরীরে একখানা হাড় আস্ত থাকবে না।

আমার মুখের দিকে চেয়ে মামার সন্দেহ বোধ হয় একেবারে নিশ্চয়তায় পরিণত হ'ল। তিনি আমায় ধ'রে নির্ম্মম ভাবে মারলেন। যখন ছাড়া পেলাম তখন আর উঠবার শক্তি রইল্যো না! শুয়ে প'ড়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলাম।

পড়সীরা সব ছুটে এলো দেখতে। যে যার মনের মত অভিমত প্রকাশ ক'রলে। একজন আমায় টেনে তুললে। পাশের বাড়ীর বাবুর যিনি সঙ্গিনী, তিনি একটু পর্দ্দানশীন। ঘর থেকে বেরুতে গেলে আধ হাত ঘোমটা টেনে যান, যদিও সদর রাস্তার কলতলায় গা ধুতে তাঁর বাধে না। কারু সামনে তিনি বেরোন

না, কারও সঙ্গে কথা কন না। আমার অবস্থা দেখে তিনিও ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এলেন।

ঘোমটার আড়াল থেকে তিনি বেশ স্পষ্টভাবে মৃদুস্বরে ব'ল্লেন, "কি হারামজাদী মাগী গো! খামকা ছেলেটাকে এমনি ক'রে মার খাওয়ালে!"

বিমলি সে কথা শুনে সিংহীর মত তেড়ে গিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিলে। তার করাতবিনিন্দিত কণ্ঠের উচ্চ নিক্কণ এ পাড়ায় সুপরিচিত ছিল, এবং বাছা বাছা অভিধান বহির্ভূত শব্দ তার জিহ্বাগ্রে যেমন অবলীলাক্রমে খেলে যেত তার তুলনা নেই। এমন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্‌যোদ্ধ্রীর সঙ্গে ওই শান্ত স্বল্পভাষিণী পর্দ্দানশীন মেয়েটির কণ্ঠসংগ্রাম যে নিতান্তই এক তরফা নিস্পত্তি হবে সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু, আমাদের দেশে পরদার আড়ালে কত যে রত্ন ছড়ান আছে, কত সিংহী যে ক্ষীণ-কণ্ঠের অন্তরালে ঘুমিয়ে আছে কে তার খবর রাখে। আজ তার একটা অসামান্য দৃষ্টান্ত দেখা গেল। দেখা গেল যে, কি কণ্ঠ ঝঙ্কারে, কি অনভিধানিক শব্দ-সংগ্রহে, কি তেজস্বিতায়, কি কোন্দল-বিক্রমে, বিমলি আমাদের অবগুণ্ঠিতা প্রতিবেশিনীর পদনখের তুল্য নয়! এ এতবড় একটা নূতন আবিষ্কার যে দৈনিক ঝগড়ায় নিতান্ত অভ্যস্ত হ'লেও পাড়া-পড়সীরা দল বেঁধে দেখতে এলো আজকের ঝগড়া।

শব্দতত্ত্ব ও অলঙ্কারের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বহুবিধ অপূর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ সহকারে, অপরূপ সব অলঙ্কার দিয়ে অবগুণ্ঠিতা যখন

বিমলির অভিধানবৈরাগ্যের সমুচিত উত্তর দিয়ে তার প্রায় বাক্‌রোধ ক'রে দিলেন, তখন তিনি ছাড়লেন একটি মোক্ষম ফ্যাক্ট—তাতে সবাই একেবারে তাক্‌ লেগে গেল—আমি পর্য্যন্ত। অবগুণ্ঠিতা ব'ল্লেন যে কয়েক দিন ধ'রে দুপুর বেলায় বইওয়ালাকে গোপনে ঘরে ডেকে বিমলি বই বেচেছে, অবগুণ্ঠিতা তা স্বচক্ষে দেখেছেন। নিজে চুরী ক'রে যে শতেক খোয়ারী গয়রহ এমনি দুধের ছেলের নামে মিথ্যে ক'রে লাগিয়ে তাকে এমনি মার খাওয়ায় তার মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অগ্নি সংযোগ ক'রে তিনি ব'ল্লেন, আর যে অনামুখো গয়রহ মিন্সে এমনি হারামজাদী গয়রহের কথায় খামখা এমনি ক'রে দুধের ছেলেকে মারতে পারে তারও মুখে আগুন ইত্যাদি।—

কথাটা শুনে আমি কান্না ভুলে গিয়ে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম এর পর আর বিমলির কথা কইবার মুখ নাই। কিন্তু জানতাম না যে মুখ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কইবার মত কিছু থাক না থাক তাতে কিছু আসে যায় না—কথা অনায়াসে বলা যায়। বিমলিও অনেক কথাই ব'ল্লে—তার মধ্যে প্রধানতঃ অবগুণ্ঠিতার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সম্বন্ধে কতকগুলি অসম্ভব কুৎসিৎ কথা বললে এবং তার শরীরের বিবিধ অঙ্গ সম্বন্ধে নানা প্রকার অবৈধ ব্যবস্থা ক'রলে। অবগুণ্ঠিতা হার মানলে না। তার বাক্যস্রোত সমান অবাধে চল্লো। দু'জনের বক্তৃতাই এক সঙ্গে চল্লো, শেষ পর্য্যন্ত বিমলি চোখের জল দিয়ে মুখের কথার শক্তিবৃদ্ধি ক'রতে গিয়ে প্রকারান্তরে হার স্বীকার ক'রলে।

এই দুইটি বাকপটু রমণীর বাক্যলীলার প্রসঙ্গ ক্রমে কারও বুঝতে বাকী রইলো না যে অবগুণ্ঠিতা যা ব'লেছে তা সম্পূর্ণ সত্য। মামাও তা বুঝতে পারলেন। তাই শেষে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিমলির সংক্ষিপ্ত কেশ মুঠোয় ধ'রে তাকে হিড় হিড় ক'রে ঘরে টেনে নিয়ে তার পিঠে মারলেন এক কীল। অবগুণ্ঠিতা অপসৃত ঘোমটা লম্বা ক'রে টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকলে।

দেখে আমি আনন্দে নেচে উঠলাম। নিজে যে মারটা খেয়েছি সে আর মনে রইলো না, বিমলির দুর্দ্দশা দেখে উল্লাসে একেবারে লাফিয়ে উঠলাম! ভাবলাম, "কেমন জব্দ! আমার সঙ্গে লাগতে এসো!"

কিন্তু আমার হিসাব, দেখলাম ভুল হ'য়েছে। যদিচ মামা একটা কীল দিয়েছিলেন, কিন্তু বিমলি তা' আঠার আনা ক'রে উশুল ক'রে নিলে তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে চুল ছিঁড়ে আর বাপান্ত ক'রে গাল দিয়ে। আর তার পর বিমলি কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঘরের এক পাশে ঘুসি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ফুলতে লাগলো।

দেখলাম, মামা যেন একটু কাবু হ'য়ে গেছেন। তিনি গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলেন। তারপর অপেক্ষা কৃত নরম সুরে ব'ল্লেন; "তুই কেন বই বেচলি?"

"বেশ ক'রেছি বেচেছি—তাতে তোর বাপের কি? আমার ঘর জঞ্জাল হ'য়ে থাকে আমি ফেলে দিয়েছি। বেশ ক'রেছি—তুই বলবার কে?"

এ কথার ভিতর যুক্তি এক ফোঁটাও ছিল না, কিন্তু তেজ যথেষ্ট

ছিল। আর সেই তেজটায় মামা, দেখলাম বড় কাবু হ'য়ে গেলেন।

তিনি ব'ল্লেন, "যাকগে যাক—ঢের হ'য়েছে, আর কথায় কাজ নেই—এখন গা ধুবি যা।"

"ঢের হ'য়েছে?—এখনি হয়েছে কি? আমার গায় হাত তুলিস্ এত বড় * * * ইত্যাদি

মামা ব'ল্লেন, "মিথ্যে চেঁচাচ্ছিস্, তুই আমার করবি কি?"

"তোর পিণ্ডি চটকাব। তোর বুকের রক্ত টেনে খাব—তোর ছেলের মাথা খাব"—ইত্যাদি—

দেখতে পেলাম যে মামার সঙ্গে বিমলি অনায়াসে জিতে গেল। মামার পরাজয়ের পরিমাণটা টের পেলাম সেই দিন রাত্রে, যখন শেষ পর্য্যন্ত মামা বিমলির পায় ধ'রে সাধা সাধি ক'রে তাকে ভাত খাওয়ালেন।

[৫]

পরের দিন দুপুর বেলায় যখন মালতীর ঘরে গেলাম, তখন মালতী জিজ্ঞাসা ক'রলে, "ব্যাপারটা কি ঠিক বলতো। তুমিই কি বই চুরি ক'রেছ?"

আমি বল্লাম, "না মালতী"—

মালতী আমার হাত ধ'রে মিনতির ভাবে ব'ল্লে, "আমাকে মালতী ব'লবে না বল; দিদি ব'লবে—কেমন?"

আমি ভারী খুসী হ'য়ে ব'ল্লাম, "আচ্ছা দিদি, তাই—আমি বই চুরি করি নি। ওই বিমলিই ওগুলো বেচেছে—সেই বই-ওয়ালার কাছে, যার কাছ থেকে এ বইখানা এনেছিলাম। সেই দিনই ও তাকে ডেকে নিয়ে কি ব'লছিল। তার পর একদিন সেই বইওয়ালা আসতেই আমাকে খামখা নেবু আনবার নাম ক'রে পাঠিয়ে দিলে। তখনই ও বেচেছে।"

"Birds and Beasts" বইখানা মালতীর ঘরে ছিল। সে বইখানা হাতে ক'রে নাড়া চাড়া ক'রছিল। সে চট্ ক'রে ব'ল্লে, "বই-ওয়ালাকে এ বইয়ের দাম দিয়েছ?"

আমি লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলাম।

মালতী ব'ল্লে "ছি, ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে চুরী ক'রেছ?"

এ তিরস্কারে যেন আমার সমস্ত অন্তর লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে

ডুবে গেল। আমি আমতা আমতা ক'রে ব'ল্লাম, "আমি পয়সা কোথায় পাব?"

"পয়সা না থাকলে চুরী ক'রবে? এ ছোট লোকের কাজ। সত্যি সত্যি যারা ভদ্রলোক তারা না খেয়ে ম'রবে, গলার দড়ি দেবে তবু চুরী ক'রবে না।"

আমার যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল। মামার কাছে হাজার মার খেয়ে একটু অনুতাপ হয় নি কোনও দিন, কিন্তু মালতীর এ স্নেহের তিরস্কারে আমার মনটা ধিক্কারে ভ'রে উঠলো।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি থপ্ ক'রে মালতীর পায় হাত দিয়ে ব'ল্লাম, "এই বারটি মাপ কর—আর কখনও করবো না।"

তাড়া তাড়ি আমার হাত ধ'রে ফেলে মালতী ব'ল্লে, "ছি বামুন হ'য়ে পায় হাত দিতে আছে?" ব'লে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে ব'ল্লে, "আমি মাপ ক'রবার কে ভাই? মাপ চাও ভগবানের কাছে, বল আর ক'রবো না। তা ছাড়া, তুমি সেই বইওয়ালাকে খুঁজে বের ক'রে তাকে এ বইখানা দিয়ে এসো।"

বইখানা ফিরিয়ে দেবার কথায় আমার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠলো। কিছু বল্লাম না আমি; মাথা নীচু ক'রে রইলাম।

মালতী দিদি কিন্তু আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। তাই সে ব'ল্লে, "না হয় তো তাকে এ বইয়ের দাম দিয়ে এসো।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি বল্লাম, "দাম কোথায় পাব? বইখানাই দিয়ে আসবো।"

আমার চিবুক ধ'রে একটু ম্লান হাসি হেসে দিদি ব'ল্লে, "দাম যা' হয় আমি দেব ভাই।"

কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে আমার দুই চোখ ভ'রে উঠলো।

তার পর মালতী গিয়ে শুলো, আমি প'ড়তে লাগলাম।

একটু পরে বাইরে কে মালতীর দোরে ঘা দিয়ে' ব'ল্লে, "মালতী, দোর খোল্।"

মালতী শুয়ে শুয়েই ব'ল্লে, "এখন আবার ম'রতে এয়েছ কি ক'রতে? যাও।"

লোকটা ব'ল্লে, "খোল্ না একটু, বড্ড দরকার আছে।"

"থাক দরকার; এই শুয়েছি আমি এখন পারবো না উঠতে।"

আমি উঠতে গেলাম, মালতী আমাকে ইসারা ক'রে চুপ ক'রে থাকতে ব'ল্লে!

"তোর পায় পড়ি মালতী একটিবার খোল্।"

"বলি তোর আপিস নেই—দুপুর বেলা মরতে এয়েছিস বড়।"

"আফিসে ব'লে এয়েছি এখুনি যাব। খোল্ না।"

লোকটা কিছুতেই ছাড়ে না দেখে মালতী উঠলো। তার খাটের তলায় একটা কাঠের সিন্দুক ছিল তার আড়ালে আমাকে লুকিয়ে থাকতে ব'লে সে দুয়োর খুলে দরজটা জুড়ে দাঁড়িয়ে ব'ল্লে "কি কথা?"

লোকটা তাকে ঠেলে ঘরে ঢুকলে। মালতী তখন চট্ ক'রে বেরিয়ে গেল।

লোকটা তাকে ডাকাডাকি ক'রলে, সে কিছুতেই এলো না।

তখন লোকটা অগত্যা বের হ'য়ে গেল। খানিকটা তফাতে গিয়ে সে মালতীর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা কইলে।

আমি কয়েকবার শুনতে পেলাম শুধু লোকটা ব'লছে "দালাল" আর কোনও কথাই শুনতে পেলাম না।

লোকটাকে সদর রাস্তায় পৌছে দিয়ে মালতী ঘরে ফিরলো। দোরে খিল দিয়ে সে আমাকে বের হ'তে ব'ল্লে।

আমি বেরিয়ে ব'ল্লাম, "ও কে দিদি?"

সে ব'ল্লে, "আছে একটা লোক। হাঁ, আজ কি পড়ছো তুমি?"

আমি তার প্রশ্ন অগ্রাহ্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "ও কেন এসেছিল?"

"দরকার ছিল। থাক্‌গে তুমি পড়।"

"কি দরকার দিদি?"

"ছিল এমনি দরকার।"

"ও দালালের কথা কি ব'লছিল?"

মালতী একটু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছিল। কথাটা কিছুতেই এড়াতে পারে না দেখে সে হেসে আমার চিবুক ধ'রে ব'ল্লে, "সে সব কথা এখনো জানবার বয়েস হয়নি তোমার ভাই!"

এখন প্রায় সবটাই আমি বুঝে ফেল্লাম, শুধু বুঝলাম না ঐ দালালের কথাটা। মালতী দিদি আমাকে যতটা আনাড়ি ভাবে আমি তা তো নই। সে আমার কাছে তার যে দিকটা মন্দ সেটা বরাবরই ঢেকে রাখে—আর তার যারা সমধর্ম্মী তাদের কাছ

থেকে আমাকে যথাসম্ভব আড়াল ক'রে রাখে। আমিও সে প্রসঙ্গ কখনও তুলিনা, তোলবার দরকারও হয় না।

আমি এলেই সে তার দোরে খিল দিয়ে দেয়, আমি পড়ি, সে মাঝে মাঝে শোনে, কখনও বা ঘুমায়। তার ঘরে একটা হারমোনিয়ম আছে। মালতী তিন চারটা গান বাজিয়ে গাইতে পারে। সে কখনও কখনও গায়, আমি শুনি। এমনি ক'রে সেই ঘরের মধ্যে আমরা দুটি ভাই বোনের মত আমাদের দুপুরের অবসরটা আনন্দে কাটিয়ে দি।

যে বাড়ীর ভিতর মালতীর ঘর, সেখানা বেশ বড় বাড়ী, তবে ভাঙ্গাচোরা। তার সামনের দিকটায় একটা হোটেল, আর দু-ধারে দুখানা দোকান। দু-মহলা বাড়ী, বাইরের মহলে হোটেল, ভিতরের মহলের ঘরগুলো মালতী আর তারই মত কয়েকজন মেয়ে ভাড়া নিয়ে আছে।

ভিতরের উঠানের দিকে মালতীর ঘরের একটা দরজা আছে। সে দিকটা আমি থাকতে সে কখনও খোলে না। তার ওপাশে বিকেল হ'লে মেয়ে মানুষের কথা শুনতে পাওয়া যায়, তা ছাড়া সেদিকের সঙ্গে আমার অন্য পরিচয় নেই। দু' একদিন ভিতরের দরজায় ঘা দিয়ে মেয়েরা তাকে ডেকেছে, মালতী দোর খোলে নি। নেহাৎ না পারলে সে হয় আমাকে বের ক'রে দিয়েছে, না হয় আপনি বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে ভিতরে গিয়েছে।

এমনি ক'রে এদের দৃষ্টি থেকে আগলে মালতী আমায় রাখতো।

এই ঘটনার পরের দিন দুপুর বেলায় সেই লোকটা আবার

এলো। মালতী বিরক্তও হ'ল আর যেন একটু ভয়ও হ'ল তার। আজ সে আমায় খাটের তলায় না লুকিয়ে আমার হাত ধ'রে একটু ভাবলে। তার পর সে নিঃশব্দে ভিতরের দরজা খুলে আমাকে বের ক'রে দিলে। ব'ল্লে, "সাঁ ক'রে বেরিয়ে যাও, কোনও দিকে চেয়ো না।" তার পর দোরে খিল দিয়ে সে ওধারের দরজা খুল্‌লে।

মালতীর ঘর থেকে আমি বেরিয়ে প'ড়লাম ভেতরের উঠানে। সেখানে যা দেখলাম তাতে চমকে উঠলাম। মেয়েমানুষের নির্লজ্জতা যে কতদূর হ'তে পারে তা সেইদিন প্রথম আবিষ্কার ক'রলাম।

আমি লজ্জায় একরকম চোখ বুজে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

বেরিয়েই দেখি—সর্ব্বনাশ !—মামা সেখানে।

আমাকে দেখে মামা তেড়ে এসে ব'ল্লেন, "এখানে কি হ'চ্ছে ?" তার পর আর বাক্যব্যয় না ক'রে প্রবল বেগে কাণ মুচড়ে ধ'রে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরে। আমি মনে মনে মরণের চিন্তা ক'রতে লাগলাম।

সেদিন যা মার খেলাম সে চিরদিন স্মরণ থাকবে। মারধোর ক'রে একগাছা দড়ি এনে আমার হাত পা বেঁধে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

দুঃখে ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু তবু কেন যে ঐ বাড়ীতে গিয়েছিলাম সে কথা খুলে ব'ল্লাম না। তা' হ'লে মালতীদিদির কাছে যাওয়া আমার জন্মের মত ঘুঁচে যাবে মনে হ'ল তাই ব'ল্লাম না।

বিমলির কলকণ্ঠ একেবারে সপ্তমে চড়ে গেল। প্রথমে সে

অবাক্ হ'ল এইটুকু ছেলের "খানকীর" বাড়ীর দিকে রোখ দেখে। তারপর সে অবাক্ হ'ল 'খানকী' মাগীদের বজ্জাতি দেখে। সতী সাধ্বী বিমলির পক্ষে মালতীদের 'খানকি' ব'লে গালাগাল দেওয়ায় আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হ'ল দুর্জ্জয় রাগ।

মনে মনে সঙ্কল্প ক'রলাম, যা থাকে বরাতে এখানে আর থাকবো না। না হয় ট্রাম চাপা প'ড়ে আত্মহত্যা ক'রবো তবু এখানে থাকবো না। একবার ছাড়া পেলে হয়।

বাঁধন আমার বেশীক্ষণ রইলো না। থাকলে কাজ ক'রবে কে? বিমলিই শেষে বাঁধন খুলে আমায় কলতলায় পাঠালে।

ভাবলাম, কলতলায় মালতী এলে এখনি তাকে ব'লবো একটা উপায় ঠাওরাতে। আর একদিনও এখানে থাকতে ইচ্ছা ছিল না।

জল ভরছি আর ভাবছি; এমন সময় দেখি একখানা ঠিকে গাড়ী ক'রে খুব সেজে গুজে চ'লেছে মালতী আর তার মা।

মালতীকে এতটা সাজতে কখনও দেখি নি। সেজে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আমি হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সে আমায় দেখে হাসলে, একটু যেন লজ্জিত ভাবে।

গাড়ীর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আমি ব'ল্লাম, "কোথায় যাচ্ছ দিদি?"

"যাচ্ছি এক জায়গায়," ব'লে সে একটু হাসলে।

"ফিরবে কখন?"

"হয় তো কাল ফিরবো।"

তার মা হেসে ব'ল্লে, "ফিরবে না হাতী।"

মালতী একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে ব'ল্লে, "না যদি ফিরি তবে

তোমায় চিঠি দেব। চিঠি পেলে আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রো ভাই।"

"আচ্ছা" ব'লে আমি কলতলায় ফিরে এলাম। এতক্ষণে হুঁস হ'ল যে মামা কি বিমলি যদি দেখতে পেয়ে থাকে তবে তো মরণ। চারদিক চেয়ে দেখলাম। কেউ দেখে নি।

সঙ্কল্প ক'রেছিলাম আজ রাত্রেই পালাব। মালতীর কথায় থেমে গেলাম। তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে পরামর্শ না ক'রে তো যাওয়া যায় না। তাই র'য়ে গেলাম।

পরের দিন সাবধানে মালতীর ঘরের দিকে গেলাম। দেখলাম তালা বন্ধ। তবে আসা হয়নি তার—তার মার কথাই ঠিক। মনটা ভারি দমে গেল।

*　　*　　*　　*　　*

কিছু ভাল লাগে না। বিমলির এ গোলামী অসহ্য ভার হ'য়ে উঠলো। এ কয় মাস এ বাঁধনটা অনুভবই ক'রতে পারি নি। মালতীর সঙ্গে রোজ দুপুরে যে আনন্দে সময়টা কাটাতাম, তার স্মৃতিতে লঘু হ'য়ে উঠতো দিনের কার্য্যভার, তার প্রতীক্ষায় তুচ্ছ হ'য়ে যেত দিনের সব নির্য্যাতন। একটা আনন্দের স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দিন গুলো কেটে যাচ্ছিল। সে স্বপ্ন হঠাৎ মিলিয়ে গেল। হাতপায় যে বেড়ী এতদিন সোলার মত হাল্‌কা হ'য়ে গিয়েছিল সে একেবারে জগদ্দল পাথরের মত ভারী হ'য়ে চেপে বসলো।

মালতীর কোনও খবরই পাই না। পিয়ন যখন আসে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি—সে চ'লে যায়—চিঠি আমার নেই। তাকে দেখে

আমার মুখ উজ্জল হ'য়ে ওঠে—সে চলে গেলে ছাই ঢেলে দেয় আমার মুখে বুকে!

এমনি ক'রে দিনের পর দিন চললো। সে কি এক একটা দিন না এক এক বছর—না যুগ। কাটতে আর চায়না সে দিন।

এক দিন সেই বইওয়ালা এলো। অমনি মনে হ'ল মালতী দিদির কথা। ভুলে গেলাম যে মালতী নেই। তার ঘরের দিকে গিয়ে দেখলাম তালা বন্ধ। জানাই ছিল, তবু প্রাণের ভিতর একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগলো। বই যখন নেই, মালতীও নেই, তখন আর বইওয়ালাকে কিছু দেওয়া গেল না। আমার চুরীর অপরাধ র'য়ে গেল। বুকের ভিতর কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো মালতীদিদির কথাগুলো। তীব্র ব্যথার সঙ্গে অনুভব ক'রলাম যে চোর আমি, চোরই র'য়ে গেলাম। একেবারে ব'সে প'ড়লাম। মালতীদিদি যে নেই, সেই ব্যথাটা শতগুণ হ'য়ে মনটাকে দগ্ধাতে লাগলো।

খানিক ভেবে ছুটে গেলাম সেই বইওয়ালার পেছনে। তার নাগাল পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "তুমি কোথায় থাক বইওয়ালা?"

সে সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লে, "কেন?"

"দরকার আছে।"

আরও সন্দিগ্ধ ভাবে সে ব'ল্লে, "কি দরকার?"

আমি ব'ল্লাম, "বইয়ের দরকার।"

"কি বই?"

"দেখবো তোমার কাছে কি বই আছে—কিনবো। তা ছাড়া বেচবো কয়েকখানা বই।"

"তুমি কোথায় থাক?"

"এইখানে" ব'লে দেখিয়ে দিলাম।

সে খানিকক্ষণ ভেবে ব'ল্লে, "আচ্ছা, এসো," ব'লে ঠিকানাটা ব'লে দিলে।

বুড়ো প্রথম ভাবছিল বুঝি আমি কোনও চোরাই মালের তল্লাস ক'রতে যাব। তারপরে তার মনে হ'ল বোধহয় যে চোরাই মাল বেচবারই আমার গরজ। ঘরে গিয়ে দেওয়ালের গায় এক জায়গায় ঠিকানাটা লিখে রাখলাম। মনে হ'ল, মিথ্যে রাখলাম। মালতীদিদির দেখাও আর পাব না বুড়োকে বইয়ের দামও দিতে পারবো না!

সেইদিন বিকেলে যখন কলতলায় জল ভরছি তখন একখানা ঠিকে গাড়ী আমাদের ঘর আর মালতীদের গলির মাঝা মাঝি এসে দাঁড়াল, মনে হ'ল ভিতরে মেয়েছেলে আছে।

আমার বুকের ভিতরটা নেচে উঠলো—মালতী বুঝি এলো! চক্ষুময় হ'য়ে চেয়ে রইলাম। একজন লোক গাড়ী থেকে নামলো —চমকে উঠলাম। আমার মামার বাড়ীর দেশের লোক। এই ম'রেছে, এখনি তো সব প্রকাশ হ'য়ে যাবে!

কি কাণ্ডটা যে হবে হুড় হুড় ক'রে ভেবে ফেল্লাম!

আমি সেই দেশ থেকে এসে অবধি কোনও খবরই লিখি নি দেশে। কি লিখবো ছাই? আমার যে এই দশা হ'য়েছে এ

কথা ভাবতে আমার দুঃখও হ'ত—আর তার চেয়ে বেশী হ'ত লজ্জা! বড় দেমাক ক'রে দেশ থেকে এসেছিলাম, এখন গাঁয়ের ছেলেরা যদি জানতে পারে যে আমি এমনি হ'য়ে আছি তবে আমার মাথা কাটা যাবে! তা ছাড়া মাও দুঃখ পাবে! তাই লিখি নি কিছু। মামা মাঝে মাঝে হয় তো খবর দিত! তাই দেশের লোক দেখে ভারী ভয় লেগে গেল। আমি আর কলতলা থেকে নড়লাম না। দেখতে লাগলাম।

কিন্তু তারপর যখন সেই লোকটা ঘর ঠিক ক'রে গাড়ীর কাছে এসে একটি মেয়েকে গাড়ী থেকে নামালে—আর চেয়ে দেখলাম সে মেয়ে আমার মামীমা—আমার হাত পা তখন ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপে উঠলো! হ'য়েছে! এইবারে হবে একটা খুনো খুনী কাণ্ড!

মামীমা ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম বিমলি বেরিয়ে এলো—মার মূর্ত্তি!

আমি আর সে দিকে চাইতে পারলাম না। কলতলায় বালতী ফেলে আমি চোঁ চাঁ ছুট দিলাম পাশের একটা গলি দিয়ে—অনেক দূরে।

ঘুরতে ঘুরতে জগুবাবুর বাজারে গিয়ে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা ক'রে ভয়ে ভয়ে ফিরলাম আবার ঘরের দিকে। ফিরতে আর পা সরছিল না। ভাবছিলাম, না জানি গিয়ে কি কাণ্ড দেখবো।

কলতলায় পৌছুবার আগেই দেখা হ'ল ডাকপিওনের সঙ্গে। সে আমাকে চিনতো। ব'ল্লে, "এই ছোকরা তোমার চিঠি আছে নিয়ে যাও।"

চিঠি নিয়ে প'ড়লাম—মালতী লিখেছে! আনন্দে প্রাণ নেচে উঠলো।

মালতী তার ঠিকানা দিয়েছে, আর সকাল থেকে ৪টার মধ্যে গিয়ে দেখা ক'রতে লিখেছে।

বাঁচা গেল। এখন আর নাই ফিরলাম মামার ওখানে। কে জানে এতক্ষণ কি কাণ্ড হ'য়ে গেছে সেখানে! তা' ছাড়া এমনিই মামীর কাছে আমার মুখ দেখাতে ভারী লজ্জা ক'রছিল!

আমি ফিরলাম। পথে পথে ঘুরে কাটালাম সন্ধ্যে বেলাটা। রাত্তিরে ক্ষিদেয় খানিকটা ছট্‌ফটিয়ে বড় রাস্তার একটা বাড়ীর রোয়াকে প'ড়ে ঘুম দিলাম। সকালে উঠেই ছুটলাম মালতীর সন্ধানে।

* * * *

অনেক দিন পর মামীমার খবরটা জানতে পেরেছিলাম। বিমলি তাকে দেখেই মুখ ঝামটা দিয়ে তেড়ে গিয়েছিল—কিছুতেই তাকে মামার ঘরে উঠতে দেবে না ব'লে। মামীমা বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো—নড়লেও না চড়লেও না। সঙ্গের যে লোকটি এসেছিল সে বিমলির সঙ্গে ঝগড়া ক'রলে। মামীমা নড়ে না দেখে বিমলি যখন একটা বেড়ী নিয়ে মামীমার মাথায় এক ঘা দড়াম ক'রে বসিয়ে দিলে তখন সে লোকটা গিয়ে বিমলিকে খুব ক' ঘা ক'সে দিলে। তারপর কুরুক্ষেত্র লেগে গেল।

মামা এসে পৌছুলেন ঠিক তার মাঝখানে। বিমলির রাগটা তখন গিয়ে পড়লো তাঁর উপর। তাঁকে মেরে, খামচে, কামড়ে অস্থির ক'রে তুল্লে। মামা খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থেকে

শেষে মামীর উপর এসে প'ড়লেন তাকে যা না তাই ক'রে গালাগালি ক'রে বাড়ী ফিরতে ব'ল্লেন।

মামীমা যতক্ষণ পারলে মাটি কামড়ে প'ড়ে রইলো। তারপর হঠাৎ উঠে চ'লে গেল দেশের সেই লোকটীর সঙ্গে।

---

[৬]

মালতী ঠিকানা দিয়েছিল মনোহর পুকুরের একটা নম্বর। বিমলিকে শত শত ধন্যবাদ সে এই এক বছরের মধ্যে নানা ধান্ধায় চারদিকে পাঠিয়ে পাঠিয়ে আমার এ দিকটার পথ ঘাট চেনবার উপায় ক'রে দিয়েছে। তা' ছাড়া ক'লকাতার পথে চলাটা আমার অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে।

তাই ঠিকানা পেয়ে সে বাড়ীতে পৌছান আমার পক্ষে শক্ত হ'ল না। কিন্তু বিপদে প'ড়লাম সেখানে পৌছে।

তখন মনোহর পুকুর ছিল অনেকটা পাড়া গাঁয়ের মত। বাগান, পুকুর, ডোবা, কুঁড়ে ঘর, ঘন গাছ পালায় ভরতি ছিল এ অঞ্চল। পাকা বাড়ী বড় বেশী ছিল না, বেশীর ভাগ ছিল গোলপাতার ঘর।

তার মাঝখানে আর সব বাড়ী থেকে তফাতে একখানা ছোট-খাট কিন্তু খুব সুন্দর নতুন দোতলা বাড়ী—ঠিকানা মিলিয়ে দেখলাম সেই বাড়ীর ঠিকানাই মালতী দিয়েছে।

বাড়ীর চারদিকে ছোট খাট সাজান বাগান, আর বাড়ীর ভিতরটা যতদূর দেখা যায় বেশ ভাল আসবাবে সাজান।

এ বাড়ীতে মালতী থাকবে কোথায়? নিশ্চয় ঠিকানা ভুল হ'য়েছে। আশে পাশে কোথাও আর ছোট বাড়ী-টাড়ী দেখলাম না।

খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় আমার নাম ধ'রে কে ডাকলে। তাকিয়ে দেখি ঐ বাড়ীর দোতলার জানালায়—মালতী দিদি। কিন্তু সে মালতীই নয়। সোনার হার সোনার চুড়ি পরেছে, সেমিজ প'রে ফরাসডাঙ্গার সাড়ী প'রে দিব্যি সেজে ব'সে র'য়েছে।

আমার অবস্থা দেখে হেসে সে ব'ল্লে, "দাঁড়িয়ে দেখছো কি ভাই? চ'লে এসো,—উপরে এসো।"

আমার বিব্রত ভাব কাটলো না। বাড়ীর ভেতর সসঙ্কোচে ঢুকলাম। চকচকে লাল মেঝে, তারপর মার্ব্বেল পাথরের বারান্দা, দেখে শুনে চকমকিয়ে গেলাম। পাশেই কাঠের সিঁড়ি, তার উপর কার্পেট বিছান। উঠতে সাহস হ'ল না। কেউ যদি বকে?

চারদিকে চাইতে চাইতে চোরের মত ধীরে ধীরে উঠে গেলাম। দোতলায় উঠতেই মালতী হাসিমুখে এসে আমায় জড়িয়ে ধ'রে টেনে নিয়ে গেল একটা ঘরে।

সে ঘরে তকতকে নূতন একটা খাট, তাতে পুরু গদীপাতা ধব্ধবে বিছানা। এক পাশে ড্রেসিং টেব্ল আর মেঝেয় গালিচা পাতা। গালিচার উপর সে আমাকে নিয়ে ব'সলো।

আমার কেমন ভয় ভয় ক'রতে লাগলো। কেবল মনে হ'ল এখনি কেউ এসে গলা ধাক্কা দিয়ে আমায় বের ক'রে দেবে বাড়ী থেকে।

আমি সসঙ্কোচে বল্লাম, "হাঁ দিদি এ বাড়ী কার?"

হেসে সে ব'ল্লে, "আমার।"

মালতীর বাড়ী! অবাক হ'য়ে গেলাম। একখানা বইয়ে সিণ্ডারেলার গল্প প'ড়েছিলাম, মনে প'ড়ে গেল।

কোন পরী এসে মালতীকে সিণ্ডারেলার মত হঠাৎ রাণী বানিয়ে দিয়ে গেল তাই ভাবতে লাগলাম। ভারী আনন্দ হ'ল। ঠিক তলিয়ে বোঝবার কোনও চেষ্টাই ক'রলাম না কিসে এ সব হ'ল। ভাববার মত অবস্থা থাকলে হয় তো ভেবে ঠিক ক'রতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম না; শুধু আনন্দের সঙ্গে মালতী দিদির এ সৌভাগ্য উপভোগ ক'রলাম।

আসবাবগুলো দেখিয়ে ব'ল্লাম, "এ সব তোমার?"

"হাঁ ভাই—কেন? বিশ্বাস হ'চ্ছে না?"

ঘাড় নেড়ে ব'ল্লাম "হাঁ," কিন্তু ঠিক যেন সব বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলাম না।

মালতী দিদি আমাকে পেট ভরে খাবার খাওয়ালে। এমন খাবার আমি জন্মে চ'খে দেখি নি।

অনেকক্ষণ দু'জনে গল্প সল্প ক'রলাম। ঘুরে ফিরে বাড়ীটা দেখলাম।

তার পর আবার ব'সে মালতী দিদি আমাকে জিগ্‌গেস ক'রলে, "তুমি ইস্কুলে পড়বে ভাই?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লাম, "পড়তে পেলে তো পড়ি, কিন্তু পারি কই?"

মালতী ব'ল্লে, "পারবে—আমি তোমাকে পড়াব।"

আমি ব'ল্লাম, "মামা ছাড়বেন না হয় তো।"

খিল খিল ক'রে হেসে মালতী ব'ল্লে, "তা বই কি? তা' হ'লে তার ভাত রাঁধবে কে? কিন্তু তুমি যেয়ো না আর ফিরে। তোমার মামা সন্ধান পাবে না। এখানেই থাকবে এখানে থেকেই পড়বে।"

মামার কাছে এর পর ফিরবার কথা ভাবতে আমার বুক দুর দুর ক'রছিল, তাই দ্বিগুণ আনন্দে প্রাণ নেচে উঠলো। পড়তে পাবো—মালতীর কাছে থাকতে পাবো—আনন্দের আর সীমা নেই।

একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে মালতী ব'ল্লে, "দেখ, সব কথা তোমায় খুলে ব'লতে পারছি নে ভাই, কিন্তু এখানে থাকতে হ'লে ঠিক আমি যেমন যেমন বলবো, তুমি তেমনি ক'রবে। বুঝলে?—তোমার একটু কাজ ক'রতে হবে। এই সন্ধ্যেবেলায় দু'তিন জনের মত রান্না ক'রতে হ'বে। রাঁধতে তো জানই তুমি, আর আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। লোকের সামনে তোমায় আমি বামুন ঠাকুর ব'লে ডাকবো। লোকের কাছে তুমি যে আমার ভাই কি আমায় চেন এ কথা প্রকাশ করবে না। বুঝলে? কেমন?"—

এতে আপত্তির কোনও কারণ দেখলাম না। কিন্তু এত সব লুকোচুরীর প্রস্তাবে মনে বড় কৌতূহল হ'ল।

সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেলে মালতী আমাকে নীচের একখানা ঘরে নিয়ে গেল। ছোট সে ঘরখানা কিন্তু দিব্যি সুন্দর—আমার পক্ষে তো অমরাবতী। সে ব'ল্লে এইটে হবে আমার ঘর, এখানে শোব এখানে পড়াশুনা ক'রবো। সারাদিন আমার যা ইচ্ছা ক'রতে পারবো। সন্ধ্যেবেলায় দুটো রান্না ক'রে এসে এ ঘরে ঢুকবো, আর

মালতী না ডাকলে বেরুব না। সে ডাকলে যা' বলবে ক'রে আবার ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকবো।

কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। এ যেন আমার না-পড়া কোনও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের একটা প্লট্। একটু ভয় ভয় ক'রলো, কিন্তু তবু একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের উল্লাসে প্রাণ নেচে উঠলো।

আমি র'য়ে গেলাম। দুপুর বেলায় নিজে রেঁধে খেলাম, আর সন্ধ্যে বেলায় গিয়ে মালতীর নির্দ্দেশ মত নানা রকম সুখাদ্য রান্না ক'রে, ঘরে গিয়ে খিল দিলাম।

রাত্রি আটটায় একখানা মোটর এলো। একটি বাবু এসে নামলেন। আমি আমার জানালা থেকে দেখলাম, দিব্যি ফিট-ফাট বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের ছোট্ট-খাট্টো একটি সুপুরুষ। তাঁর সঙ্গে একটি মোসাহেব গোছের লোক।

বাবু উপরে গেলেন।

বাড়ীতে আমি আর একটি ঝি ছাড়া কেউ সর্ব্বদা থাকতো না। একটু তফাতে একটা গোলপাতার ঘরে এক উড়ে মালী থাকতো। কিন্তু বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ জন চাকর এলো—তারা বাড়ীখানাকে সরগরম ক'রে ফেললে।

একটু বেশী রাত্তিরে, আমি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম, একজন এসে দোরে ধাক্কা দিতে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। রান্নাঘরে মালতী দিদি এসে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছিল। সে ব'ল্লে, "তাড়াতাড়ি লুচি ক'খানা ভেজে' তরকারীগুলো গরম ক'রে ফেল—বামুন ঠাকুর।" ব'লে একটু মুচকে হাসলো।

ঝি লুচি বেলছিল। আমি খুব ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে কাজে লেগে গেলুম, মালতী পাশে দাঁড়িয়ে দেখা শোনা ক'রতে লাগলে।

লুচি ভাজতে ভাজতে দেখি বাবু নেমে এসে রান্নাঘরে হাজির। আমার হাত কেঁপে উঠলো।

মালতী হেসে ব'ল্লে, "তুমি এলে যে?"

"দেখতে এলাম কেমন ধারা বামুন জোগাড় ক'রেছ তুমি?" ব'লে আমাকে ব'ল্লেন, "কি হে ছোকরা, নাম কি তোমার?"

আমি ব'ল্লাম। আমার বাড়ী, গোত্র, গোষ্ঠী সবার খবর নিয়ে আমাকে এক পাশে ডেকে ব'ল্লেন, "গায়ত্রী বল তো?"

ব'ল্লাম।

সন্ধ্যে ক'রবার মন্ত্র-টন্ত্র জিগ্‌গেস ক'রলেন। তাও ব'ল্লাম।

বাবু তখন মালতীকে ব'ল্লেন, "না' এ সত্যি সত্যি বামুনই বটে— চ'লবে একে দিয়ে। হাঁ তুমি চলে এসো শীগ্‌গির।" ব'লে মালতীর পিঠ চাপড়ে একটু আদর ক'রে তিনি উপরে চ'লে গেলেন। মালতী ও আমি দুজনেই লজ্জায় লাল হ'য়ে গেলাম।

বাবু চ'লে গেলে ঝি একটু হেসে ব'ল্লে, "বাবুর বড় নিষ্ঠে, না মা?"

মালতী ব'ল্লে, "ভয়ানক! সন্ধ্যে-টন্ধ্যে রীতিমত করা চাই। তাই তো বামুন রাখতে হ'ল। আমার হাতে কিছুতেই খাবেন না। যত রাত্তিরই থাকুন, না খেয়ে থাকেন। আমি ব'ল্লাম, কাজ নেই বাপু, তার চেয়ে একটা বামুন রেখে দি।—আজ সবে এখানে খাবে। এ ক'দিন এখানে জলস্পর্শ করে নি।"

হেসে ঝি ব'ল্লে, "কেবল একটি জিনিষ ছাড়া।"

মালতীও হাসলো। সে ব'ল্লে, "বলে তাতে দোষ নেই। খাবার আগে তার উপর হাত দিয়ে বিড় বিড় ক'রে কি মন্তর প'ড়ে নেয়। বলে শোধন ক'রছে।"

রান্না শেষ হ'য়ে গেলে খাবার দিয়ে এলাম। তারপর আমার ছুটি। আমি গিয়ে ঘরে দোর বন্ধ ক'রে তক্তপোষের উপর প'ড়ে রইলাম।

প্রথমে এখানে এসে মনটায় যেমন উল্লাস হ'য়েছিল, এখন তেমনি দমে' গেলাম। মালতী দিদি আমাকে যত ছোট্ট ছেলেমানুষটি ভাবুক, আমার জানতে কিছু বাকী রইলো না। বুঝতে পারলাম কি ব্যবস্থায় মালতী এ বাড়ীতে আছে, আর আমিই বা ঠিক কিসের অন্ন খাচ্ছি। গা' টা ঘিন ঘিন ক'রতে লাগলো।

এক বছর যে আবেষ্টনের ভিতর ছিলাম তাতে আমার নীতিজ্ঞানের কঠোরতা অনেকটাই ক'মে গিয়েছিল। পাড়াগাঁয় থাকতে স্ত্রীপুরুষের যে সম্পর্কটা সম্বন্ধে জানা ছিল খুব কম, কৌতূহল ছিল ভয়ানক—অথচ নিতান্ত অবৈধ ও ভয়াবহ ব'লে তাকে জানতাম, সেটার সম্বন্ধে জেনেছি অনেক, আর তার অবৈধতা অনেকটা গা সওয়া হ'য়ে গেছে। পাপ ব'লে তাকে আর বড় ঘৃণা করতাম না, বরঞ্চ কৌতুক ও পরিহাসের বিষয় ব'লেই তাকে মনে ক'রতে শিখেছিলাম। কিন্তু তবু এই পাপটার সঙ্গে নিজের এমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় নি। কাজেই সেই পাপটাই যখন হ'ল আমার উপজীবিকার উপায় তখন আমার অন্তরের সমস্ত শুচিতা জমাট হ'য়ে তার বিরোধী হ'য়ে দাঁড়াল। মামার

কাছে ছিলাম, সেটাও বড় পূণ্যস্থান নয়। কিন্তু তবু খেতাম সেখানে মামার অন্ন—বিমলির অন্ন তো খাই নি! তা ছাড়া মালতী যে আমার চক্ষের সামনে এই সব ক'রবে আর আমি এই বাড়ীতে ব'সে তা চেয়ে দেখবো, এতে আমার বড্ড রাগ হ'ল। মালতী যে বেশ্যা সে কথা অনেক দিনই জানি। কিন্তু তবু আমাদের এ কয় মাসের সম্পর্কের মাধুর্য্যের ভিতর এই জ্ঞানটা একেবারে চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। আমি তাকে ঠিক আপনার বড় বোনটির মত দেখতে আরম্ভ ক'রেছিলাম, তা' ছাড়া তার যে অন্য সত্তা আছে সে কথা মনের ভিতর আসতে পারে নি।

তাই মালতীর সঙ্গে এই পুরুষটার এমনি সম্পর্ক দেখে আমার মনটা জ্বলে' বিষিয়ে উঠলো। কিছুতেই এ কথাটা বরদাস্ত ক'রতে পারলাম না। আমার মনের ভাবটা হ'ল অদ্ভুত—মালতীর উপর রাগ আমি ক'রতে পারলাম না, সমস্ত দোষটা ঘাড়ে চাপালাম ঐ বাবুটির—যেন সেই মালতীর উপর একটা অত্যাচার ক'রছে।

প্রকৃত অবস্থাটা তখন আমি জানতাম না। জানলেও যে কোনও ইতর বিশেষ হ'ত তা' মনে হয় না। পরে জানতে পেরেছিলাম যে এ ব্যাপারের ভিতর বঞ্চিত যদি কেউ হ'য়ে থাকে তবে সে ঐ বাবুটি। দালাল তাকে মালতীর সম্বন্ধে যে সব কথা ব'লেছিল, এবং যে পরিচয়ে মালতীকে তাঁর ঘাড়ে চড়া দামে গছিয়েছিল সেটা মালতীর সত্য পরিচয় নয়। সে ব'লেছিল, মালতী ছিল কুলবধূ, সদ্য কুলত্যাগ ক'রেছে। কথাটা সত্য নয়—যদিও মালতীকে ঠিক বেশ্যার মেয়ে বলা চলে না। মালতীর মা

ছিল স্বকৃতভঙ্গ—মালতী তার স্বামীরই মেয়ে। মালতীর বাপ ছিলেন পদস্থ ভদ্রলোক, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার। অর্থের তাঁর অভাব ছিল না। কিন্তু তবু তিনি মারা গেলে তাঁর যুবতী বিধবা সে সম্পদ ছেড়েই কুলত্যাগ ক'রেছিল। তার ফলে জীবনে অনেক শাস্তিই সে ভোগ ক'রেছে। একদিন যাদের সঙ্গে কথা কইতে সে অপমান বোধ ক'রতো, তেমন লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে শেষে অনেকদিন দিন চালাতে হ'য়েছে। এতদিনে মালতীর মূল্যে সে কিছু টাকা কড়ি হাতে ক'রে তীর্থে গেছে। হতভাগীর কোন্ পাপ তীর্থ-পর্য্যটনে ঘুচবে তা জানি না। কিন্তু পেটের মেয়ের এই যে সর্ব্বনাশ সে ক'রে গেছে, এ পাপ তার তীর্থ পর্য্যটনেও ঘুচবে না, সহস্র অশ্বমেধেও না।

মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। এতদিন মালতীর বৃত্তি জানা থাকলেও তাকে জানতাম যে ভাবে সে ভাবটা ছিল পবিত্র—তার ভিতর ময়লা কিছু ছিল না। আজ তার ক্লেদময় আবেষ্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হ'য়ে মনটা ভয়ানক কেঁদে উঠলো। মনে হ'ল যে আমার যেন সর্ব্বস্ব ভেসে গেল। মালতী দিদি—আমার সত্যিকারের দিদি—জন্ম জন্মান্তরের দিদি-তাকে এই পাপমলিন আবেষ্টনের ভিতর দেখে যেন সমস্ত প্রাণটা নিদারুণ ব্যথায় মুচড়ে উঠলো।

ভারী রাগ হ'ল। মনে হ'ল, থাকবো না আমি এখানে। যেখানে দু চক্ষু যায় চ'লে যাব—তবু এই সব চ'খে দেখবো না। তার চেয়ে জানবো মালতী নেই—ম'রে গেছে!

ভাবতে বড় কান্না পেল। স্নেহহীন জীবনের আমার একমাত্র স্নেহময়ী প্রীতিময়ীকে ছেড়ে যাবার কল্পনায় কান্না পেল। বুক যেন ফেটে যেতে লাগলো। পড়ে' পড়ে' শুধু কাঁদলাম।

উপর থেকে হল্লা এসে মাঝে মাঝে কাণে ঢুকতে লাগলো—তাতে শিউরে উঠলাম। আমার বুকের ভিতর ঐ সব মত্ত চীৎকারের ধ্বনি ছুরীর মত ব'সে যাচ্ছিল। দু'হাতে বুকটা চেপে ধ'রে আমি পড়ে রইলাম—কাঁদতে লাগলাম।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে প'ড়লাম। খাওয়া হ'ল না—খেতে ইচ্ছাই হ'ল না।

---

[৭]

পরের দিন সকালে উঠে মালতী আমার দোরে ধাক্কা দিলে। আমার ঘুম তখন ভেঙ্গেছে, আমি ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে রয়েছি। উঠে দোর খুলে দিলাম।

স্মিত হাস্যে মালতী আমায় সম্ভাষণ ক'রলে। আমার তপ্ত প্রাণ যেন শীতল হ'য়ে গেল। হাত ধ'রে আমায় সে টেনে নিয়ে গেল উপরে।

ব'ল্লে, "তোমার চেহারা অমন হ'য়েছে কেন বটুক ভাই? রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি।"

আমি ব'ল্লাম, "না, কিছু নয়—ঘুমিয়েছি।"

কাল রাত্রে আমার প্রাণের ভিতর যে কাল-বৈশাখীর মেঘ গর্জ্জে উঠেছিল, মালতীর কাছে আসতেই যেন সে কোথায় মিলিয়ে গেল। তার মিষ্টি কথা, তার সুস্পষ্ট গভীর স্নেহ, তার অপরূপ কোমল কান্তি, সব মিলে যে কি একটা মোহ রচনা করে, তার কাছে এলে আমার আর কোনও জ্ঞান থাকে না, শুধু তার আমার মধ্যে যে পরম সুন্দর স্নেহ সম্বন্ধ সেই টুকুর উপভোগে আমি তন্ময় হয়ে যাই।

অনেকক্ষণ দুজনে গল্প গুজব ক'রলাম। মালতী গৃহকর্ম্ম ক'রতে

লাগলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে কাজ ক'রতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ওরই মধ্যে হুড়োমুড়ি ক'রে খেলতে লাগলাম তার সঙ্গে। এখন আমার মনেই হ'ল না যে তার আমার এই স্নেহ সম্বন্ধের মধ্যে কোনও ব্যবধান বা কোনও ছায়াপাত আছে।

তার পর সে নাইতে গেল। আমাকে ব'ল্লে, "তুমি তো আমার হাতে খাবে না, তুমি নেয়ে তোমার মত কিছু রান্না ক'রে নাও।"

আমি তাই ক'রলাম। আমি রাঁধলাম, জোগাড় দিল মালতী। সে অনেক রকম তরকারীর আয়োজন ক'রেছিল। আমি ব'ল্লাম, "এত কি হবে ?"

মালতী হেসে ব'ল্লে, "রাঁধ না, আমি পেসাদ পাব'খন।"

আমি হাসলাম। মালতীকে খাওয়াবার উৎসাহে রান্নাটা খুব বেশী যত্ন ক'রে ক'রলাম।

কাল রাত্রে মনটা অন্ধকার হ'য়ে ছিল যে সব কথায় তার কোনও ছায়ামাত্র রইলো না।

খাওয়া দাওয়ার পর মালতী আমাকে টাকা দিয়ে ব'ল্লে "তুমি এখন গিয়ে কোনও একটা স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে এসো গে। পারবে তো একা ?"

টাকা হাতে ক'রে পথে বেরিয়ে গেলাম। মনটা খুব হাল্কা হ'য়ে ছিল, মন্দ কথা মনেই হ'তে পারলো না।

একটা স্কুলে গেলাম। অনেক খোঁজ খবর ক'রে আফিসে গিয়ে ভর্ত্তি হ'তে চাইলাম। তারা আমায় একটা ফর্ম্ম দিয়ে ব'ল্লে "এটা লিখিয়ে নিয়ে এসো।"

আমি সে ভদ্রলোককে বল্লাম, "এটা কাকে দিয়ে লিখিয়ে আনবো স্যর ?"

"তোমার বাবা—"

"বাবা তো নেই আমার।"

"তোমার গার্জ্জেন যিনি থাকেন।"

গার্জ্জেন ? কার নাম ব'লবো ? মামার নাম দেওয়া অসম্ভব। মালতীর ?—হঠাৎ খচ্ ক'রে কথাটা মনের ভিতর খোঁচা দিলে যে তার নাম দিলে আমার মান থাকবে না। যে ব্যথাটা আজ সকাল থেকে একেবারে চাপা প'ড়ে গিয়েছিল সেটা আবার নতুন ক'রে পীড়া দিতে লাগলো। আমি ব'সে প'ড়লাম।

অনেকক্ষণ ক্ষুণ্ণমনে ব'সে থেকে শেষে উঠে গিয়ে কেরাণী বাবুকে করুণভাবে ব'ল্লাম, "দেখুন, আমার মা আছেন দেশে। এখানে আমার কেউ নেই। একজনকে একবেলা রেঁধে দি—তিনি আমার পড়ার খরচ দেবেন ব'লে। আমার গার্জ্জেন কেউ নেই। কাকে দিয়ে লেখাব ?"

কেরাণী বাবু ব'ল্লেন, "তবে কেমন ক'রে হবে ?"

কেরাণী বাবুর পাশে এক ভদ্রলোক এলেন—কেরাণী বাবু উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমার কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন—আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তিনি হেড্ মাষ্টার।

কেরাণী বাবুকে কি একটা কথা ব'লে তিনি আমাকে তাঁর

ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেইখানে অনেকক্ষণ আমাকে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ ক'রলেন। তাঁর বেশীর ভাগ কথার ঠিক ঠিক জবাব দিলাম, কেবল মালতীর কথাটা চেপে গেলাম।

শেষে হেড্‌মাষ্টার আমার পিঠ চাপড়ে ব'ল্লেন "You are a brave boy. আমি তোমাকে ভর্ত্তি ক'রে নেব।"

ভর্ত্তি হ'য়ে ক্লাশে গিয়ে ব'সলাম। আমাকে থার্ডক্লাশে নেওয়া হ'ল।

বইয়ের লিষ্ট নিয়ে বই কিনতে গিয়ে মনে হ'ল সেই বুড়ো বইওয়ালার কথা। তার সে বইয়ের দাম দেওয়া হয় নি। ঠিকানাটা মনে ছিল। তার কাছে এক আধখানা আমার পাঠ্য বই পাওয়া গেল; তা কিনলাম। তার পর ব'ল্লাম সে সেদিন "Birds and Beasts" ফেলে এসেছিল আমি সেখানা নিয়েছি—তার দামটাও তাকে দিলাম। বাকী বই নতুন বইয়ের দোকান থেকে কিনে বাড়ী ফিরলাম।

হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে কথা কইবার পর থেকে সারাদিন আমার মনটা খচ্‌ খচ্‌ ক'রছিল। হেড্‌মাষ্টার লোকটি বড় দয়ালু, মিষ্টস্বভাব। তাঁর কাছে মালতীর কথাটা গোপন ক'রে বঞ্চনা ক'রতে আমার মনে বড় বাধছিল। ভারি অস্বস্তি বোধ ক'রছিলাম। তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে অবধি মনে হ'চ্ছিল, এমনি ক'রে গোপন ক'রে আমার চিরদিন চালাতে হ'বে। চলবে কি চিরদিন?

সঙ্গে সঙ্গে আমার বর্ত্তমান অবস্থার হীনতা ও ঘৃণ্যতার কথা

ভেবে মনটা বিরক্ত হ'য়ে গেল। মালতীর কথা ভেবে মনটা ভারি বিষণ্ণ ও অবসন্ন হ'য়ে উঠলো। কাল রাত্রে যত কথা মনে হ'য়েছিল সব আবার মনে প'ড়ল। যখন বাড়ী ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধ্যে। ভারী ক্লান্ত ও অবসন্ন মন নিয়ে ফিরে এলাম।

নিজের ঘরে গিয়ে গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলাম। ব'সে ভাবতে লাগলাম। মালতীর কাছে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। ভারী একটা রাগ হ'তে লাগলো, কিন্তু কোনও একজন বিশিষ্ট লোকের উপর নয়।

অনেকক্ষণ ব'সে থাকবার পর দেখি মালতী আমার ঘরে এসে হাজির। একগাল হাসি হেসে সে খুব উৎফুল্ল ভাবে ব'ল্লে, "স্কুলে পড়ে এলে ভাই ?"

তাকে দেখেই যেন আমি আর একজন হ'য়ে গেলাম। একটু হেসে ব'ল্লাম, "হাঁ দিদি।"

সে ব'ল্লে, "তা' এতক্ষণ এসেছ, উপরে যাও নি কেন? আমি সেই থেকে ব'সেই আছি তুমি আসবে ব'লে। ভারী হয়রাণ হ'য়েছ বুঝি। মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

ব'লে মুখখানা ধ'রে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম পুঁছে দিলে। তার পর ব'ল্লে, "ওঠ, মুখ হাত ধুয়ে উপরে চল, দুটো মুখে দাও কিছু।"

ব'লে এক রকম ঠেলে আমায় ওঠালে। আমার মনের মেঘ তার দুটো কথায়, তার স্নেহস্পর্শে, কেটে গেল।

এতক্ষণ ব'সে ভাবছিলাম কত কথা। একবার ভাবছিলাম থাকবো না এখানে। যাব চ'লে। হেড্‌মাষ্টার বাবুকে ধ'রলে তিনি আমার একটা উপায় ক'রে দেবেন। ভাবছিলাম মালতীকে আমি স্পষ্টাস্পষ্টি বলবো, হাজার হোক, ভদ্রলোকের ছেলে আমি, এ আমার পোষাবে না। তখনই মনে হ'ল মালতী সে কথা শুনলে বড় কষ্ট পাবে। এত ভালবাসে আমায় সে, তাকে এমনি কড়া কথাটা বলা উচিত হ'বে না। আমি চুপ চাপ চ'লে যাব। আর একটা কিছু জোগাড় ক'রে চ'লে গেলে মালতী মানা ক'রবে না। আর কিছু বলবারও দরকার হবে না। আবার ভাবছিলাম, মালতীকে আমি ভাল ক'রবো। কেমন ক'রে ক'রবো তাই ভাবছিলাম। আমি লেখাপড়া শিখে যখন মানুষ হব, তখন তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব নিজের বাড়ীতে; সৎপথে থেকে যাতে তার চলে সে ব্যবস্থা করবো। আবার ভাবছিলাম, যাই হোক, মালতীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা কথা কওয়া উচিত। সে যে ভারী অন্যায় কাজ ক'রছে, আমি যে এর জন্য তার উপর রাগ ক'রেছি সে কথা তাকে বলা দরকার! স্পষ্টাস্পষ্টি তার সঙ্গে কথাটা আলোচনা করবার জন্য মন ব্যাকুল হ'চ্ছিল। আর কথাটা কেমন ক'রে বলবো, আর সে তার কি জবাব দেবে এই সব মনে মনে মুশাবিদা ক'রছিলাম।

মালতীর সঙ্গে দুটো কথা কইবার পর আর সে কথা ভাবতেও পারলাম না। একে ঐ সব কথা ব'লে লজ্জা দেওয়া বা অপমান করাটা ভারী গর্হিত হবে মনে হ'ল। এখন মনে হ'ল এর কাছে

ও সব কথা বলাই অসম্ভব। আর কেনই বা ব'লবো? বেশ্যার মেয়ে ও, এ ছাড়া ও ক'রবে কি? অবশ্য আমি যখন মানুষ হ'ব তখনকার কথা আলাদা—তখন আমি ওকে টেনে নিয়ে যাব আমার ঘরে। কিন্তু এখন ও আর কি ক'রবে? আরও সব কত সদ্‌যুক্তি সার বন্দী হ'য়ে মনের ভিতর দাঁড়াল। এখানে এমনি আছি এতে আমার এত বেশী লজ্জাই বা কি, অপমানই বা কি? মামার কাছে থেকে একবছর পেটভাতায় বিমলির গোলামী ক'রেছি, এ আর তার চেয়ে মন্দ কি? চট্‌ ক'রে স্থির হ'য়ে গেল, চোখ মুখ বুজে ক'টা বচ্ছর এমনি কাটিয়ে দি', তার পর যখন রোজগার ক'রবো, তখন আর মালতীকে এমন থাকতে দেব না।

এই স্থির ক'রে গেলাম আমি স্নান ক'রতে। স্নান ক'রে প'রলাম একখানা নতুন কাপড, নতুন জামা। মালতী আনিয়ে রেখেছিল। মালতী যে আমার জন্য কাপড় জামা আনিয়ে রাখবে এটা এতই স্বাভাবিক মনে হ'ল যে কোনও প্রশ্ন মনে উঠলো না। সব কথা জানলে হয় তো মন খারাপ হ'ত। কেন না, পরে জানতে পেয়েছিলাম মালতী তার বাবুর নাম ক'রেই কাপড় জামা, তাঁকে দিয়েই আনিয়েছিল। বাবুটি খুব বেঁটে ও রোগা হওয়ায় তাঁর কাপড় চোপড় আমার নেহাৎ বেমানান হয়নি। আমি বয়সের অনুপাতে বেশ বড় সড় ছিলাম।

উপরে গেলাম। মালতী আমার জন্য চমৎকার খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। পরিতোষ পূর্ব্বক খেলাম। তারপর খানিক গল্প-গুজব

হ'ল। সন্ধ্যার সময় রান্নাবাড়া ক'রলাম। তার পর আমি আমার ঘরে বন্ধ হ'য়ে প'ড়তে লাগলাম।

বই হাতে নিয়ে আর আমার কোনও কথা মনে রইল না। এর পর অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মন খারাপ হবার অবসরই হ'ল না।

ইস্কুলে প'ড়তে আরম্ভ ক'রে অবধি আমার যেন একটা নতুন জীবন আরম্ভ হ'য়ে গেল, তার উৎসাহে, আনন্দে আমি দুনিয়ার আর সব কথা ভুলে গেলাম। আজ একবৎসর পড়াশোনা ক'রতে পাইনি; বঞ্চিত অন্তর আমার সেজন্য বুভুক্ষিত হ'য়ে ছিল। সেই ক্ষুধা মিটাবার অবসর পেয়ে আমি পেটুকের মত দু' হাতে গ্রাস ক'রতে লাগলাম। পড়ায় একেবারে ডুবে গেলাম। সেসনের শেষ দিকে ক্লাশে ভর্ত্তি হ'য়েছি। অনেক পড়া আমার ক'রে নিতে হ'বে—তাই আপনাকে একটুকুও অবসর দিতাম না। দিন রাত খাটতাম।

মাষ্টার ম'শায়রা আমার বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দেখে খুব প্রশংসা ক'রতে আরম্ভ করলেন। আমি আরও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলাম।

মালতীদিদির সঙ্গে এখনও অনেক গল্প সল্প হয়। মাঝে মাঝে আমি উপরে গিয়ে বসি। কিন্তু প্রায়ই সেই আমার ঘরে এসে বসে। এখন গল্পসল্প হয় বেশীর ভাগই আমার পড়াশুনার কথা, ইস্কুলের কথা, মাষ্টারের কথা, আর বিশেষ ক'রে ইস্কুলে আমার বাহাদুরীর কথা। আমার মুখে আমার সব কীর্ত্তির কথা সে শোনে, মাষ্টারেরা যে দিন যে প্রশংসা করেন তা শোনে, কোন ছাত্রকে

কি রকমে হারিয়ে দিয়েছি তা শোনে—আনন্দে, গর্ব্বে তার মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। তার আনন্দ দেখে আমার আনন্দ কূল ছাপিয়ে ওঠে—উৎসাহ ও চেষ্টা সব সীমা লঙ্ঘন ক'রে যায়।

মালতীর জীবনের যে আর একটা দিক আছে সে কথাটা সে আমার কাছে একদম চেপে যায়। সে ভাবে আমি ছেলে-মানুষ কিছু বুঝি না, আর কোনও কিছু আমাকে জানতেও দিতে চায় না।

একদিন একটা লোক এল দু' বাক্স মদ নিয়ে। মালতী সেগুলো উপরের একটা ঘরে রাখতে ব'ল্লে। বিলাতী মদের বাক্স তখনও আমি দেখি নি, তাই জিগ্‌গেস ক'রলাম, "ও কি দিদি?"

মালতী কথা চাপা দিয়ে ব'ল্লে, "আছে সব জিনিষ পত্তর।"

আমি আরও দুই একটা প্রশ্ন ক'রলাম, সে এড়াবার চেষ্টা ক'রে গেল। শেষে হেসে সে ব'ল্লে, "কি হ'বে অত সব জেনে ভাই। সব কথা জানবার তোমার দরকার নেই।"

এতেই বুঝে গেলাম, যে ব্যাপারটা অন্যায় কিছু। ক্রমে তার স্বরূপটাও জানলাম।

তেমনি, মালতী তার বাবুর নাম বা তার কোনও কথা আকারে ইঙ্গিতেও কখনও আমার কাছে ব'লত না। বাবু আসতেন, তাঁর জন্য আমি রাঁধতাম, তাঁকে খাবার দিতাম। কিন্তু তার বেশী আমি কিছু জানি এটা তার ইচ্ছা নয়—হয় তো বা এসম্বন্ধে আমার কাছে তার কিছু লজ্জাও আছে। সে কথা টের পেতে আমার কিছুদিন দেরী হ'য়েছিল। দু' এক দিন আমি হয়তো

বাবুর নাম ক'রে কিছু ব'লেছি, দেখেছি, অমনি মালতীর মুখ রাঙা হ'য়ে গেছে—সে কথাটা চাপা দিয়েছে। একদিন তার কি একটা জিনিষের কথা ব'লছিলাম; অমনি তার মুখ লাল হ'য়ে গেল। দু'চারটা কথা ব'লতেই সে ব'ল্লে, "যাক গে যাক, পরের কথায় তোমার কাজ কি?" ব'লেই আমাকে চট ক'রে একটা ফরমায়েস ক'রে ফেল্‌লে।

এমনি ক'রে মালতী তার চরিত্রের এ দিকটা আমার কাছে একদম ঢেকে রাখতে চায়—ভাবে আমি ছেলেমানুষ, কিছু বুঝি না। যখন আমি তার এ চেষ্টা বুঝতে পারলাম তখন আমি তার এই পবিত্র ছলনাটুকুকে কোনও বাধা দিলাম না। আমিও তার কাছে ও প্রসঙ্গ খুব পরোক্ষভাবেও তুলতাম না। সে যে আমাকে এই পাপের আবহাওয়ার মাঝখানে রেখেও এমনি একটা আওতা দিয়ে আমাকে তার স্পর্শ থেকে রক্ষা ক'রবার যত্ন ক'রছে, এই করুণ চেষ্টার ভিতর তার স্নেহের গভীরতা এত স্পষ্ট ক'রে অনুভব ক'রলাম, যে তার জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেল।

তাই এমনি আমি র'য়ে গেলাম। মাস তিনেক পর পরীক্ষা দিয়ে আমি সেকেণ্ড হ'য়ে প্রমোশন পেলাম। নাচতে নাচতে দিদিকে গিয়ে ব'ল্লাম।

[৮]

কয়েক মাস পর একদিন উপরে খুব হল্লা হ'চ্ছে শুনলাম। বাবুর পাঁচ ছয়টি ইয়ার বন্ধু এসেছেন আরও মেয়েরা এয়েছে— অনেকগুলো রান্না ক'রতে হ'য়েছে আমার। এই বন্ধুদের বোধহয় ধারণা যে ষাঁড়ের মত খুব হেঁড়ে গলায় এক চোট চেঁচানই হ'চ্ছে আমোদের চরম।

আমি আমার ঘরের ভিতর খিল দিয়ে মন দিয়ে অঙ্ক কসবার চেষ্টা ক'রছিলাম। অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। চেঁচামেচি, আর মাথার উপর দোতলায় হুড়োমুড়ি এত বেশী হ'তে লাগলো যে পারলাম না। আমি চুপ ক'রে ব'সে শুনতে লাগলাম।

মালতী গোড়া থেকেই আমাকে ব'লে দিয়েছিল যে সন্ধ্যে বেলায় আমি ঘরে খিল দিয়ে থাকবো। খাবার দেবার দরকার হ'লে আমায় যখন ডাকবে তখন বেরুব। নইলে কিছুতেই বেরুব না। সে হয়তো ভেবেছিল এই হ'লেই তার রাতের কাণ্ডকারখানা আমি কিছু জানতে পারবো না। পারতামও না হয় তো যদি ঐ মদের হাঙ্গামা না থাকতো। যাই হোক, আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রলাম। নইলে এত ভয়ানক ঘৃণা বোধ হ'চ্ছিল আমার, যে মনে হ'চ্ছিল বাইরে ছুটে পালাই।

মনটা ভয়ানক ভার হ'য়ে গিয়েছিল। ভয়ানক রাগ হ'চ্ছিল

এদের উপর। এই সব কাণ্ডকারখানা যে মালতী হ'তে দেয়—এমনি ক'রে যে তাকে অপমান ক'রতে দেয় এদের—তাতে রাগ হ'চ্ছিল। কান্না পাচ্ছিল আমার। কি ক'রবো শুধু দাঁতে দাঁত লাগিয়ে প'ড়ে রইলাম।

হঠাৎ উপরে ভয়ানক দুম্ দাম শব্দ হ'ল। তার পরই কি যেন একটা ভেঙ্গে প'ড়লো—মালতী সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো, একটা বীভৎস চেঁচামেচি হ'ল। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মনে হ'ল হয় কেউ মালতীকে মেরেছে বা মারছে কিম্বা সে খুব কিছু চোট পেয়েছে।

দুম্ ক'রে দুয়ার খুলে' ফেলে এক ছুটে উপরে গিয়ে হাজির হ'লাম।

দেখলাম—যা ভেবেছিলাম তা নয়—কিন্তু যা দেখলাম এতটা কোনও দিনই ভাবতে পারি নি। আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শিউরে উঠলো। স্তব্ধ মোহমুগ্ধের মত হাঁ ক'রে আমি চেয়ে দেখলাম।

দেখলাম, মারামারি কিছু নয়—শুধু একখানা চেয়ার উল্‌টে প'ড়েছে। চারটে বদ্ধ মাতাল মালতীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রছে—উঁচু ক'রে তুলেছে তারা মালতীকে—মালতী হাসছে আর চীৎকার ক'রছে। সে দৃশ্যের বীভৎসতা ও অশ্লীলতা আর বিস্তার ক'রে বলবার দরকার নেই।

আমি আসবার একটু পরেই ওরা হাসতে হাসতে মালতীকে ছেড়ে দিলে। তার পর তারা আবার এক এক গ্লাস মদ ঢেলে

নিয়ে খেতে লাগলো, মালতীকেও এক গ্লাস দিলে। মালতী একটু ব'সে দু ঢোক খেয়ে আমার দিকে চাইলে।

তার তখন নেশা বেশ হ'য়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছিল। কিন্তু আমাকে দেখে সে হঠাৎ সুস্থ হ'য়ে গেল। মদের গেলাস নামিয়ে রেখে সে দাঁড়িয়ে উঠলো। কাপড় চোপড় যা এলোমেলো হ'য়েছিল চট্ ক'রে সুধরে নিলে। তারপর গম্ভীর ভাবে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম বাইরে, বারান্দায়—একটু তফাতে। মালতী আমার কাছে এসে ধমক দিয়ে বেশ সুস্থভাবে ব'ল্লে, "তুমি এখানে এসেছ কেন? কি কথা ছিল তোমার সঙ্গে?—যাও ঘরে যাও।"

অনেকগুলো কথা আমার মনের ভিতর জড় হ'য়ে ছিল। ভীষণ ক্রোধে অন্ধপ্রায় হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি।—অনেক চড়া চড়া কথা ব'লতে ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিছুই ব'লতে পারলাম না। শুধু অগ্নিময় দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে আমি নীচে চ'লে গেলাম।

সেদিন আর আমার বেরুবার দরকার হ'ল না। সবাই মদ খেয়ে একেবারে টং হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল—মালতীও। কেউ খেতে পারলে না। আমিও খেলাম না। অমনি মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়লাম।

আগুনের হল্কা ব'য়ে যেতে লাগলো মাথার ভিতর। রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় আমি গর গর ক'রতে লাগলাম। কি যে ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন তা' কথায় বুঝিয়ে ব'লতে পারবো না।

মালতীকে এতদিন শুধু এক মূর্ত্তিতে ধ্যান ক'রেছি, ভালবেসেছি, মনে মনে তাকে প্রণাম ক'রেছি। তার পাশে এ তার কি এক বীভৎস মূর্ত্তি! আমার মালতী দিদি এই—শুধু এই কথা ভাবতে আমার বুক ফেটে গেল, চোখ ফেটে জলের যে স্রোত বইলো তা' আর থামতে চায় না।

পাপের সঙ্গে এই বয়সেই আমার যথেষ্ট কোলাকুলি হ'য়ে গেছে। শুধু পাপ ব'লে পাপের প্রতি ঘৃণা আমার তেমন কিছু আর ছিল না। বিমলি যা ক'রতো, তাতে আমার ঘেন্নাও হ'ত না, রাগ ও হ'ত না। ও তো ওই—ও ছাড়া ও আর ক'রবে কি! মালতীর ভিতর যে পাপ আছে সেও আমি জানতাম কিন্তু সেটা এতটা চোখের আড়ালে ছিল, আর মালতীর আর একরূপ তার সামনে এমন একটা পুরু পরদা টেনে দিয়েছিল যে সেটা মনেরও আড়ালে চ'লে গিয়েছিল। কালে ভদ্রে সে কথাটা মনের ভিতর উঁকি মারতো কিন্তু কোনও উৎপাত উপস্থিত ক'রতে পারতো না; আমার সঙ্গে মালতীর যে পূণ্য সম্পর্ক, তার প্রশান্ত প্রসন্নতার উপর কোনও ছায়াপাত ক'রতে পারতো না। কিন্তু আজ সেই আড়ালটা একেবারেই দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে মালতীর এই মূর্ত্তি আমার মনের কেন্দ্রে এসে আমার হৃদয়টা দুই পায় পিষে চুরমার কর'তে লাগলো। এ ব্যথা আমি সইতে পারলাম না।

পরের দিন সকাল বেলায় আমি অভ্যাসমত বই নিয়ে প'ড়তে ব'সলাম। মনটা ভারি বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেল। এক একটা বই নিয়ে নেড়ে চেড়ে ফেলে রাখলাম। বাড়ীর অঙ্ক আর লেখা যা

ছিল কোনও মতে জোড়া তাড়া দিয়ে ক'রলাম। তার পর বিরক্ত হ'য়ে বই ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

মালতী রোজ সকালে আমার কাছে আসে। কিন্তু আজ আর এলো না।

বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ধুপধাপ ক'রে উপরে গেলাম। দেখলাম মালতী স্নানটান ক'রে সুস্থির হ'য়ে তার ভিজে চুলের রাশ খোলা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে সে মাথা নীচু ক'রে ব'সে পান সাজছে।

আমি যেতেই সে হাসিমুখে চাইলে। হাসিমুখ—কিন্তু একটু লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাব। আমার মুখ ছিল গম্ভীর—তা'কে দেখেই যেন বুকের ভিতর রাশি রাশি কান্না ঠেলা দিচ্ছিল।

দেখলাম, ঠিক আগের মত সহজভাবে কথা কওয়া তার পক্ষেও অসম্ভব, আমার পক্ষেও অসম্ভব।

আমার মুখের দিকে চেয়েই সে আস্তে আস্তে চোখটা নামিয়ে নিলে। আমিও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খানিক পরে মালতী মুখ তুলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে ব'ল্লে "কি চাই বটু ভাই?" আমি ব'ল্লাম, "কিছু না।" ব'লে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কান্না আর ঠেলে রাখতে পারছিলাম না। চোখ দিয়ে স্রোত ব'য়ে গেল।

মালতী উঠে এসে আমাকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধ'রে বসালে, সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো, কোনও কথা কইলো না। বুঝলাম তার চোখও তখন শুকনো ছিল না।

তার এই আদরে আরও কান্না পেল, তার কোলের ভিতর

মাথা লুকিয়ে প'ড়ে প'ড়ে অনেকক্ষণ শুধু প্রাণভরে কাঁদলাম। সে শুধু মাথায় হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে বলতে লাগলো, "ছি ভাই," "লক্ষ্মী ভাই"—আর কিছু নয়।

এ কান্নার মত, দুঃখের এমন স্নিগ্ধ মহৌষধ আর নেই। কেঁদে কেঁদে বুকটা যেন অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল। তখন আমি উঠে ব'সলাম। মালতী তার আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুখ মুছিয়ে দিলে।

তার পর মাটির দিকে চেয়ে মালতী ব'ল্লে, "ভাই আমায় মাপ কর।"

আমি ব'ল্লাম, "কেন—কেন—কেন তুমি"—

কি ব'লবো ? ওর মুখের দিকে চেয়ে কিছুই ব'লতে পারলাম না। ঐ পর্য্যন্ত ব'লেই থেমে গেলাম।

বলবার দরকারও হ'ল না। মালতীও বুঝলে। সে ব'ল্লে, "কেন ?—তোমায় কেমন ক'রে বুঝিয়ে ব'লবো ভাই ? এসব কথা তোমার জানতে নেই। যখন বড় হ'বে তখন ব'লবো। এখন আমায় শুধু দিদি ব'লে মাপ ক'রে যাও।"

আমি রাগ ক'রে ব'ল্লাম, "আমায় যত ছেলেমানুষ ভাব আমি তা' নই। আমি জানি সব, বুঝিও সব। আর তুমিই বা এমন কি বুড়ী—আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় বই তো নও।"

আমার যুক্তির কাছে সে বোধ হয় হালে পানি পেল না। তাই সে ব'ল্লে, "সে হোক, তবু, তোমায় আমি এসব কথা ব'লবো না, তুমিও জানতে চেও না।"

আমি ব'ল্লাম, "বেশ না বল না ব'ল্লে ; ব'লবার আছেই বা

কি? তা বেশ, থাক তুমি, আমি তোমার কাছে আর থাকবো না।"

একবার করুণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তার পর অনেকক্ষণ পর—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লে, "তা যাও। তোমাকে এখানে ধ'রে রাখা আমার উচিতও নয়।"

"তবে আমি চ'ল্লাম", ব'লে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সে যেন চমকে উঠলো। "এখুনি? এখন যাবে কোথায়? আজ থাক, যাবার একটা জায়গা ঠিক ঠাক কর, তার পর যেও।" সেও চঞ্চল হ'য়ে উঠে দাঁড়াল।

আমি ব'ল্লাম, "না আমি এক্ষুণি যাব।" ব'লে চ'ল্লাম।

সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাত ধ'রে ব'ল্লে, "লক্ষী ভাই আমার, এত রাগ ক'রো না। এখুনি কোথায় যাবে? কোথায় ভেসে বেড়াবে? আমি যে ভেবে ম'রবো। দুটো দিন থেকে গেলে এমন কি লোকসান হবে? বিমলির কাছেও তো ছিলে তুমি এতদিন।"

ফিরে দাঁড়িয়ে আমি ব'ল্লাম, "বিমলি! সে বিমলি—তুমি আর বিমলি তাই ব'লে এক নও!"

সে হাত ছেড়ে দিয়ে ব'ল্লে, "না ভাই এক নই, কিন্তু আবার একই—সেও যা আমিও তাই।"

"সে হোক গে আমি চ'ল্লাম।"

এবার সে ধ'রলে না। একটু স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে।

তারপর ব'ল্লে, আচ্ছা যাও—কিন্তু একটু দাঁড়াও।" ব'লে সে তার শোবার ঘরে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে কয়েকখানা নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হাত ধ'রে ব'ল্লে, "এই ক'টা টাকা নিয়ে যাও—আর বিপদ আপদ হ'লে আমায় খবরটা দিও।"

তার গলাটা যেন কান্নায় ধ'রে যাচ্ছিল! কিন্তু আমি সে সব গ্রাহ্য না ক'রে নোট ক'খানা ছুঁড়ে ফেলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলাম।

সে বারান্দায় একটা লোহার থাম ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একবার মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চাইলাম। দেখে থমকে গেলাম।

সেইখানেই সে একেবারে গ'লে প'ড়েছে আর মাটিতে মুখ গুঁজে শুধু ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি নড়তে পারলাম না, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুধু চেয়ে দেখলাম। তার কান্না দেখে যেন বুকটা ফেটে গেল। চোখ জলে ভরে' গেল।

তার পর ফিরলাম। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, "দিদি।"

মালতী মুখ তুললে না। সে পড়ে কাঁদতেই লাগলো।

আমি তখন ব'সে তার মাথাটা কোলের উপর তুলে ব'ল্লাম, "দিদি ছোট ভাইটিকে মাপ কর।"

এইবার দিদি আমায় জড়িয়ে ধ'রে আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো—আমিও কাঁদলাম।

তার পর—অনেকক্ষণ পর সে মাথা তুলে উঠে ব'সলো। চুলগুলো তার আলুথালু হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়েছে, মুখের সঙ্গে অনেকগুলো চুল লেগে র'য়েছে। তার মুখ দেখে বুক যেন ফেটে গেল।

আমি ব'ল্লাম, "দিদি, এইবারটি মাপ কর; আর আমি তোমাকে ছেড়ে যাবার নামও ক'রবো না।"

দিদি আমাকে তার কোলের কাছে টেনে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে, "তুই আমার উপর রাগ ক'রেছিস ভাই। রাগ করবি নে কেন? কিন্তু এ ছাড়া আমি ক'রবো কি?"

আমার চোদ্দ বছরের বুদ্ধিতে এর উত্তর আমি খুঁজে পেলাম না। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

দিদি ব'ল্লে, "এই কি আমার করবার কথা? আমার বাবা ছিলেন বড়লোক, অনেক টাকা কড়ি ছিল তাঁর। আমার আজ দুঃখ কিসের? মা আমার মাথা খেয়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছে তাই না আজ আমার এ দশা!"

এ কথা আমি এই প্রথম শুনলাম, শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলাম —চমকে উঠে ব'ল্লাম, "তাই নাকি?"

মালতী ব'ল্লে, "নিজের সর্ব্বনাশ তো ক'রলে হতভাগী, আমাকে যদি ভালবেসে সঙ্গে ক'রে না আনতো, সে বাড়ীর আঁস্তাকুড়েও যদি আমায় ফেলে আসতো' তবে কি আমার এই অবস্থা হয়। আজ তো আমার সব পথ খেয়ে ব'সেছি—এ ছাড়া আর ক'রবো কি?"

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, ব'ল্লাম, "আচ্ছা, এক কাজ ক'রলে হয় না—তোমার বাপের বাড়ীতে খবর দিলে কেমন হয়।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে ব'ল্লে, "বোকা ছেলে, সংসারের কিছু জানো না। তারা আমায় নেবে কেন? তা ছাড়া মার কাছে শুনেছি যে আমার এক কাকা আছেন, তাঁর অত্যাচারে সে ঘরে থাকতেই অতিষ্ঠ হ'য়েছিল। তিনি এখন আনন্দ ক'রে আমার বিষয় খাচ্ছেন, আমাকে হয়তো বাপের মেয়ে ব'লে স্বীকারই ক'রবেন না। এক,—মার কথা, তা তার কথা বিশ্বাস ক'রবে কে?"

সব রাগ দুঃখ, আমার ধুয়ে গিয়েছিল। গভীর সমবেদনায় চিত্ত আমার আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। আমি তাকে টেনে ধ'রে তুললাম। তাকে ঘরে বসিয়ে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে গল্প সল্প ক'রলাম।

তারপর যখন সে সুস্থ হ'ল, তখন তাকে ছেড়ে আমি ইস্কুলে গেলাম।

তার পর আর কোনও দিন আমি মালতীর প্রমোদশালার দিকে রাত্রে যাই নি।

কিন্তু একদিন দেখলাম সকাল বেলায় সে মদ খেয়েছে। খুব বেশী নয়, কিন্তু বেশ টের পাওয়া গেল খেয়েছে।

দেখে আমার কান্না পেল। মালতী আগে কখনও মদ খেত না। এখানে এসেই মদ খেতে শিখেছে। হায়, অভাগিনী যদি এই দোষটাও ছাড়তে পারতো।

আমি তার কাছে গিয়ে ব'ল্লাম, "দিদি, একটা কথা আমার রাখবে ?"

হেসে সে ব'ল্লে, "কি কথা ?"

আমি ব'ল্লাম, "বল রাখবে ?"

সে ব'ল্লে, "বুঝতে পেরেছি। কথা দিতে পারবো না ভাই।"

"কেন পারবে না ? মদ ছাড়তে পারবে না ব'লে ? কেন, আগে তো তুমি মদ খেতে না !"

"আগে আর এখন ! অনেক তফাৎ !"

"কি তফাৎ !"

"সে কথা তুমি বুঝবে না—তোমার বড়রাও বুঝবে না।"

"কিন্তু বুঝি আর না বুঝি, আমার কথা তোমার রাখতে হবে। মদ তুমি আর খেতে পারবে না।"

সে ব'ল্লে, "তবে যে ম'রে যাব রে পাগল।"

"মদ না খেলে লোক মরে না, বাঁচে।"

"কিন্তু আমি বাঁচবো না। কেমন ক'রে বাঁচবো ? আমার যা সইতে হয়, হাসিমুখে যা ক'রতে হয়, মদ না খেলে তা কেউ পারে ?—ওসব তুমি বুঝবে না ভাই।"

আমি সত্যি বুঝলাম না। বোঝাবার কোন চেষ্টাও ক'রতে পারলাম না।

কান্না পেল, চোখ পুঁছলাম। আমার কান্না দেখে মালতী ব্যাকুল হ'য়ে গেল। সে শেষে ব'ল্লে, "আচ্ছা তোর কথা রাখবো যা !—রাত্তিরে ওরা যখন আসবে তখন ছাড়া আর মদ খাবো না। কেমন ?—খুসী তো ?"

খুসী না হ'য়ে আর উপায় কি? এর বেশী তো আর হবার জো নেই।

কথা সে অনেকটা রেখেছিল, কিন্তু ষোল আনা পারে নি। এ দানব এমন নয় যে তার দাসত্ব স্বীকার ক'রলে স্বাধীনতার কিছু অবশিষ্ট থাকে। তাই মালতী মাঝে মাঝে আমাকে লুকিয়ে দিনের বেলাও খেত। কিন্তু খুব বেশী দিন নয়।

[৮]

মালতী তার জীবনের ছায়াচ্ছন্ন অংশের উপর যে সূক্ষ্ম পরদা টেনে আমার কাছ থেকে সেটা আড়াল ক'রে রেখেছিল সেটা যে এমনি ক'রে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল সেটা ভাল হ'ল না। সে পরদাটা রেখেছিল আমার মঙ্গলের জন্য, কিন্তু মঙ্গল তাতে দু' জনেরই হ'চ্ছিল। এই যে একটা লুকোচুরি, এই যে ঢাকবার একটা চেষ্টা এর তলায় ছিল একটা আন্তরিক সঙ্কোচ, তাই পাপটা একেবারে বাঁধন ছাড়া হ'য়ে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রতে পারে নি। আমার কাছে ভাল হ'য়ে থাকতে হবে,—এই বোধটা মালতীর যতদিন ছিল ততদিন তার পাপাচার বেশ একটু সংযত ছিল। যখন সবটাই প্রকাশ হ'য়ে গেল তখন আর সংযমের কোনও দরকার রইলো না, মনের ভিতর একমাত্র বাঁধন তার যেটা ছিল সেটা আলগা হ'য়ে গিয়ে সে একেবারে বেপরোয়া হ'য়ে উঠলো। হয়তো এমনটা না হ'লেও তার এই অবস্থাই হ'ত; অনেক সময় হয় তা' শুধু অভ্যাসের ফলে।—তা ছাড়া যখন সে মদের আশ্রয় নিয়েছে তখন হয়তো সব বাধা চুরমার হ'য়েই যেতো একদিন। কিন্তু নাও হ'তে পারতো। হয়তো বা ঐ সঙ্কোচের বন্ধনটুকুর আড়াল থেকে একদিন তার শুদ্ধ আত্মা আত্মপ্রকাশ ক'রে তার পাপের পথ সঙ্কুচিত ক'রে ফেলতো।

এখন আর সে তার বাবুর সম্বন্ধে বা তার আনাগোণা কি কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথা কইতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করে না। বাবুর সঙ্গে কোনও কথা নিয়ে তর্ক হ'লে সে কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করে, তার কোনও দোষ দেখলে আমার কাছে অভিযোগ করে। তার ইয়ারদের সমালোচনা করে।

শুধু এই নয়, দেখতে পেলাম ক্রমে তার কথাবার্ত্তার মধ্যে যে ভদ্রলোকের মেয়ের মত শালীনতা ও সংযম ছিল, যাতে ক'রে প্রথম প্রথম আমার তার সঙ্গে মেলা মেশা ক'রতে কখনও কোনও বাধা হয় নি—কোনও দিন মনেই হয়নি যে মালতী ভাল মেয়ে বই আর কিছু—সেই শালীনতা ও সংযম আস্তে আস্তে ঘুচে গিয়ে যেন একটু বেপরদা ইতর ভাব এসে প'ড়ছে। খুব বেশী নয়, তবু বেশ অনুভব করা যায় যে বাবুদের ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে সংস্পর্শে যে ভাবটা জন্মেছে সেটা আমার কাছেও প্রকাশ হ'চ্ছে। সেটা ঢাকবার সে বিশেষ চেষ্টা করে না, যেমন সে আগে ক'রতো। অনেক সময় এখন তার কথাবার্ত্তায় আমি লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করি, যা আগে কখনও করতাম না।

আমার পক্ষেও এর ফল খুব ভাল হয় নি। যতদিন তার কথা ও আচরণে পরদা ছিল, যতদিন যত্ন ছিল তার আমাকে ধর্ম্ম ও নীতির পথে অক্ষুণ্ণ রাখবার, ততদিন, যদিও অনেক মন্দ কথা আমি শিখেছিলাম, তবু আমার শৈশবের নীতিজ্ঞানের প্রাচীরে কোনও বিশেষ ফাট ধরে নি। আমাকে আওতায় রেখে রেখে মালতী আমার সঙ্গে যে কথা কইতো তাতে নীতিধর্ম্মের সঙ্গে কোনও

বিরোধ কোনও দিন চেঁচিয়ে উঠবার অবসর পায় নি। এখন আমার কাছে কোনও কথা আলোচনা ক'রতে তার বড় বাঁধতো না—তাই আমারও সঙ্কোচ ক্রমে কেটে যাচ্ছিল। ফলে, এর বছর খানেক পরে আমি আবিষ্কার ক'রলাম যে আগে যে সব অন্যায়ের কথা ভাবতে আমি শিউরে উঠতাম, এখন তার অনেকগুলি সম্বন্ধে আমার যে শুধু সহিষ্ণুতা জন্মেছে তাই নয়, সেগুলিকে অন্যায় ব'লেই এখন আর বড় মনে হয় না। এই পরদাটা ভেঙ্গে পড়ায় কাযেই আমাদের দু'জনেরই নীতিধর্ম্মের শিকড় ক্রমে একটু আলগা হ'য়ে প'ড়তে লাগলো।

জীবনের একটা মহা সন্ধিস্থলে, কৈশোর থেকে যৌবনে যখন আমি পদার্পণ ক'রছি ঠিক সেই সময় যে বাঁধনটা খুব বেশী শক্ত হওয়া দরকার সেইটা এমনি ক'রে আলগা হ'য়ে যাওয়ার ফল হয় তো খুবই ভয়ানক হ'তে পারতো,—হয় নি যে সে শুধু ভগবানের অনুগ্রহ।

এই যে আমাদের ভিতরকার পরিবর্ত্তণ এটা দৈনিক ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় আমি বা আর কেউ বড় ধ'রতে পারতো না—আত্মদর্শনের কোনও শুভ মুহূর্ত্তে বিশ্লেষণ ক'রলেই এটা শুধু ধরা প'ড়তো। তা ছাড়া আমাদের ভিতর চট্ ক'রে লক্ষ্য হবার মত কিছু পরিবর্ত্তণ দেখা যায় নি।

এর পর প্রায় দু'বছর আমাদের জীবনটা মোটের উপর একটানা ভাবেই চ'লেছে। আমার পড়াশোনার উৎসাহ সমান ভাবেই চ'লেছে। মালতী দিদির আমার উপর যত্ন ও ভালবাসা

সমান ভাবেই চ'লেছে। তার বাবুর বাবুগিরীও সমান ভাবেই চ'লেছে। তবে আমি এখন মালতীর গৃহস্থালীর ভিতর অনেকটা বেশী পরিমাণে হাত দি—বাজার হাট করি, বাবু এলে আর লুকিয়ে থাকি নে, সাধারণভাবে কর্ত্তৃত্বও করি।

ইতিমধ্যে যৌবনের অলক্ষ্য পদসঞ্চারে আমার শরীরও ক্রমে অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। আমি এখন আর ছোট্টটি নই, লম্বা চওড়া একটি জোয়ান—অপূর্ব্ব সুন্দর। আমার স্বভাব গৌরবর্ণের ভিতর একটা সুস্থ রক্তচ্ছটা পড়ে তা' আরও মনোহর হ'য়ে উঠেছে, মুখের শোভা এক অপূর্ব্ব পরিপুষ্ট শ্রীতে মণ্ডিত হ'য়েছে।

মালতীও বদলে গেছে। তার রং আরও ফরসা হ'য়েছে, তার শরীর একটু স্থূলতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু আপাততঃ তাতে তার সৌন্দর্য্য নষ্ট করে নি, বরং তার ভিতর একটু নূতন রকম শোভা সঞ্চার ক'রেছে। মুখখানা একটু ভারী হ'য়েছে, চোখের ভাবটা বদলে গেছে। দেখতে সে সুন্দর আগের চেয়ে কম নয়, কিন্তু আগে তার সৌন্দর্য্যের ভিতর যে স্বচ্ছ নিরাবিল ঋজু ভাব, যে সরল সুস্থ চঞ্চলতা ছিল তার স্থানে এসেছে একটা গভীরতা ও ঢল ঢল বিহ্বলতা।

আমাদের শরীর ও মনের এ সব পরিবর্ত্তণ বাইরের লোকের চোখে প'ড়তো, আমাদের চোখে এটা বড় লাগতো না। দিনের পর দিন আমাদের চ'লে যেত সমান একটানা—এতগুলো পরিবর্ত্তণ যে আমাদের হ'য়ে গেছে সে সব কথা চোখে প'ড়তো না, মনেও হ'ত না।

সেদিন আমি বাইরের ঘরে ব'সে প'ড়ছি, মদের দোকানের দ্বারোয়ান এসে ব'ল্লে "বাবু একটা কেসের রসিদ লিখে দিন।"

এটা এখন একটা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি রসিদ লিখে দিলাম। মুটে বেটা সেইখানেই বাক্স ফেলে যেতে চায়। আমি ব'ল্লাম, এখানে নয় উপরে রেখে দিতে হবে।

তাকে সঙ্গে ক'রে উপরে যে ঘরে মদ টদ থাকে সেখানে নিয়ে গেলাম।

বাক্সটা সেখানে রেখে মুটে চ'লে গেলে মালতী আমায় ব'ল্লে, "বটু ভাই, কেসটা খুলে বোতলগুলো তুলে রেখে দাও না। আজ আর এক ফোঁটাও খোলা নেই, সন্ধ্যে বেলা এলেই কুরুক্ষেত্র লেগে যাবে।"

অম্লান বদনে মালতী আমাকে এখন এ কথা বলে। আমারও কানে বাঁধে না।

আমি ব'ল্লাম, "খুলে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি সন্ধ্যার আগে ছোঁবে না তো?"

"আরে না রে না পাগল, আমি খাব না। বিশ্বাস না হয়, তুই কর্কস্ক্রুটা তোর কাছে রেখে দে।"

"দাও" ব'লে কর্কস্ক্রুটা পকেটে পুরে আমি কেস্ খুলে মদের বোতলগুলো আলমারীতে সাজিয়ে রাখলাম।

মালতী হেসে বলে, "মদের উপর তোর এত রাগ কেন বল দিকি নি? মদ খেলে কি হয়?"

আমি হেসে ব'ল্লাম, "মদ খেলে মাতাল হয়, এই, আর কিছু নয়। কিন্তু তাই যথেষ্ট।"

"মদ খেলেই মাতাল হয় না।" ব'লে মালতী মুখ ফিরিয়ে চ'ল্ল।

আমি তাকে ধ'রে ব'ল্লাম, "কিন্তু তোমরা হও।" ব'লে হাসতে হাসতে নীচে চ'লে গেলাম।—হাস্‌তে হাসতে!

আর সেদিন এই মদের জন্যে চোখের জলের বন্যা ব'য়েছিল আমার।

মালতী বছর খানেক হয় এক ওস্তাদের কাছে গান শিখছে। বেশ শিখেছে। মাঝে মাঝে সে আমাকে গান গেয়ে শোনায়, আর ওস্তাদের কাছে যখন গান শেখে তখন আমি প্রায় গিয়ে ব'সে থাকি। তার গান আমার বড্ড ভাল লাগে।

একদিন আবার এক নতুন ওস্তাদ এলো, বীণ্ শেখাবে।

আমি ব'ল্লাম, "তোমার বাবুর দেখছি যতই বয়েস বাড়ছে ততই সখ্ বাড়ছে। শুধু গানে আশ মেটে না, আবার বীণ।"

হেসে মালতী গাইলে,

"হেসে নাও এ দুদিন বইতো নয়
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।"

"সন্ধ্যেটাকে তোমার এত ভয়?" আমি হাসলাম কিন্তু কথাটার ভিতর একটু শ্লেষ ছিল।

মালতী ব'ল্লে, "কত যে ভয় তা তুমি বুঝবে কি?" সে হাসলো না।

এমনি কথাবার্ত্তা আমাদের এখন হ'ত। এখন আর পরদাও

ছিল না, তীব্র নীতি নিষ্ঠাও ছিল না। পাপ করি নি, কিন্তু পাপের প্রতি বিরাগে আর এখন সে তীব্রতা নেই।

তবু—ভগবানের আশীর্ব্বাদে—আমাদের দু'জনার অনাবিল স্নেহ সম্বন্ধের মধ্যে কোনও খাদ মেশে নি। যৌবনের উন্মেষেও আমার ভিতর কোনও অবৈধ চপলতা আসে নি, মালতীরও আমাকে শুধু ছোট ভাইটি ছাড়া আর কিছু কোনও দিন মনে হয় নি। মনে যে হ'তে পারে এমন সম্ভাবনা আমার মনে হয় নি—একদিনের আগে! সে কথা ব'লছি।

ক্রমে আমাদের দেখা শোনাটা বড় কম হ'য়ে এলো। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য আমি প্রাণপণ ক'রে প'ড়তে লাগলাম। ভাল ক'রে জলপানি পেয়ে পাশ না ক'রতে পারলে হবে না। ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত এমনি চললো, এর পর যাতে অন্য চিন্তা মুক্ত হ'য়ে একাগ্র নিষ্ঠার সহিত প'ড়তে পারি সেজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে স্কলারশিপ লক্ষ্য ক'রে প'ড়তে লাগলাম।

রান্না আর পরিবেশনটা ক'রতে হ'ত। কিন্তু তা ছাড়া আর সব উৎপাত থেকে মালতী আমায় মুক্তি দিলে। যাতে আমার পড়াশোনার কোনও বিঘ্ন না হয় তার জন্য তার যত্নের অবধি ছিল না। সেও আর এখন আমাকে উপরে টেনে নিয়ে যায় না—মাঝে মাঝে আমারই ঘরে এসে অল্পক্ষণ গল্প ক'রে যায়।

একদিন একটু সকাল সকাল বাবুরা খেলেন। বাবুর চার পাঁচটি বন্ধু ছিলেন। তাঁরা বুদ্ধিমানের মত পরামর্শ দিলেন মজলিসটা বসুক খাওয়া দাওয়ার পরে। এখানকার সাধারণ নিয়ম ছিল

উল্টো। খাওয়া হ'ত বেশী রাত্তিরে—তখন খাওয়ার অবস্থাই বড় কারও থাকতো না। যাঁরা খেতে পারতেন তাঁরাও ঢুলতে ঢুলতে বকতে বকতে খেয়ে যেতেন—কি যে খেতেন তাও টের পেতেন না। কিন্তু আজ তাঁরা সুবুদ্ধির কাজ ক'রলেন। খাবার আগে দুপেগের বেশী কেউ খান নি, কাজেই খেতে ব'সলেন বেশ বহাল তবিয়তে।

তাইতেই বোধ হয় আজ এমন সব জিনিষ তাঁদের নজরে প'ড়তে লাগলো যা' অন্য কোনও দিন কেউ লক্ষ্যই করেন না। তার পরিচয় পেলাম দারুণ আঘাত পেয়ে।

বাবুরা ব'সে গেছেন, আমি থালায় ক'রে পরিবেশন ক'রছি। একজন বাবু আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ইংরাজীতে ব'ল্লেন, "ওহে তোমার পাচকটি তো ভারী সুন্দর।"

আমার মুখটা লাল হ'য়ে গেল, কিন্তু বোধ হয় কেউ লক্ষ্য ক'রলেন না।

আর একজন ইংরাজীতে ব'ল্লেন, "অতিরিক্ত সুন্দর" (much too handsome .)এ কি এখানেই থাকে না কি ?"—

বাবু ব'ল্লেন "হাঁ।"

একজন ব'ল্লেন, "পাহারা দেয় ?"

আর একজন ব'ল্লেন একেবারে ল্যাটিন, "পাহারা ? quis custodes ipsos custodies ?

ল্যাটিনটা আমি বুঝতে পারলাম না—কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝলাম। রাগে মনে মনে ফুলতে লাগলাম।

একজন ব'ল্লেন, "সাধু সাবধান ! মাল সামাল !"

আর একজন ইংরাজীতে ব'ল্লেন, "এই জন্যই বলে মূর্খ লোকে খানা দেয়' বুদ্ধিমানে খায়—তুমি বেটা পয়সা খরচ ক'রে পরিবেশন ক'রে দিচ্ছ এর পাতে।"

মালতী সেখানে ছিল। সে অবশ্য কিছু বুঝলে না, কেন না কথাবার্ত্তা হ'চ্ছিল ইংরাজীতে। আমার রাগে ঘৃণায় মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কাঁপছিল। এমন কুৎসিৎ কথা ভাবতে পারলে এই পাষণ্ডগুলো ? আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি পরিবেশন শেষ ক'রে দম দম ক'রে নীচে নেমে গেলাম।

একেবারে আমার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে আমি ব'সে প'ড়লাম। আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে লাগলো। ইচ্ছা হ'তে লাগলো ঐ পাপিষ্ঠগুলোর মাথা আস্ত চিবিয়ে খেতে।

অনেকক্ষণ রাগে শুধু গর্‌ গর্‌ ক'রে পরে মনে হ'ল ঐ যে ল্যাটিন কথাটা ব'ল্লে ওর মানে কি ? ডিকসনারী খুললাম। অনেক খুঁজে বের ক'রলাম—ওর মানে, "পাহারাওয়ালাকে কে পাহারা দেয় ?" শয়তানের বাচ্ছা! নিজেরা পাপিষ্ঠ তাই দুনিয়াটাকেই তেমনি মনে করে!

সেদিন রাত্রে আমার সুস্থির হ'তে অনেকটা সময় গেল। যখন রাগের বেগটা কমে' এলো তখন দারুণ মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল সারা চিত্ত!

ক্রমে মাথা ঠাণ্ডা হ'লে মনে হ'ল, না ব'লেবে কেন লোকে ? মালতীর যা চরিত্র, আর আমাদের দু'জনের যা বয়েস তাতে

আমি এখানে থাকলে এ কথা বলবেই তো! এরা কেন? বিশ্বসংসারের সব লোক ব'লবে!

ভারী দুঃখ হ'ল মনে।

মনে হ'ল মালতী আমার সত্যি সত্যি বোন হ'ল না কেন?

তা' যদি হ'ত, তবে কি পারতো সে আমাকে অগ্রাহ্য ক'রে পাপ ক'রতে? আমি যে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতাম এখান থেকে। পথে পথে ভিক্ষা মেগে তাকে খাওয়াতে পারতাম, রক্তের সম্পর্কে আমার যে জোর হ'ত, যে অধিকার থাকতো, শুধু স্নেহের সম্বন্ধে তা হয় কই?

পরের দিন মালতী আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কাল খাবার সময় ওরা কি বলছিল ইংরেজীতে?"

"কেন জিজ্ঞাসা ক'রছো বল দিকি নি?"

"পরিবেশন ক'রতে ক'রতে দেখলাম তোমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে গেল—বুঝলাম ভারী রাগ হ'য়েছে তোমার।"

"হাঁ দিদি, রাগ হ'য়েছিল, কি বলবো—চাকর আমি—নইলে হয়তো ঐখানে ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দিতাম।"

আমার চোখ সজল হ'য়ে উঠলো।

মালতী ব'ল্লে "কেন? কি ব'ল্লে ওরা?"

"সে কথা তোমার শোনবার যোগ্য নয় দিদি।"

"কেন? তোমার অপমান ক'রেছে কি?"

"আমার অপমান? ভিখিরী আমি—চাকর আমি, আমার

অপমান কে না করে। কিন্তু ওরা তোমার অপমান ক'রেছে—ভগবানের অপমান ক'রেছে!"

মালতী কি ভাবলে তা জানি না। কিন্তু অনেকদিন পর তার চোখের ভিতর দেখতে পেলাম একটা পুণ্য বিষাদ করুণ-শ্রী, যা আগে দেখেছি আজকাল বড় দেখতে পাই নে। হঠাৎ তার আত্মসম্মান যেন বহুযুগের স্বপ্ন ঝেড়ে ফেলে জাগ্রত হ'য়ে তাকে বিষাদে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে।

সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ল্লে, "আমার অপমান?—ওদের কাছে আমার মানের কিই বা আছে?"

অনেক নীচে এসে প'ড়েছে মালতী, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে এখনও তার ভিতর থেকে একটা বড় সত্তার আভাস এমনি এক একটা উদাস দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এত পরিপূর্ণ হতাশা একটা মরুভূমির মত হাহাকার ক'রে ওঠে তার এই এক আধটা ছোট কথায় যে আমার প্রাণ তাতে কেঁদে ওঠে। আমি সইতে পারি না তার এই ব্যথা।

সে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ ব'সে রইলো। তার পরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'ল্লে, "কি ব'লেছে ওরা?"

কথাটা না ব'ল্লেই ভাল হত। তবু ব'ল্লাম। খুব অস্পষ্টভাবে আকারে ইঙ্গিতে ব'ল্লাম। এত বড় একটা কুৎসিৎ কথা এখনও তার কাছে ব'লতে আমার জিভ আড়ষ্ট হ'য়ে এলো।

মালতীর মুখ লাল হ'য়ে গেল। সে চুপ ক'রে রইলো। অনেকক্ষণ সে রইলো ব'সে। চোখের কোলে দুটো বড় বড়

জলের ফোঁটা ক্রমে জমে উঠলো। তার পর সে ব'ল্লে, "ওদের দোষ নেই ভাই; ব'লবেই তো ওরা। আমি যা' তাতে না ব'লবে কেন?"—তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লে, "কিন্তু মা যদি না বাদ সাধতো তবে আজ আমি ওদেরই মা বোনের মত হ'তে পারতাম।"

তার পর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠলো। ব'ল্লে, "যাও ভাই পড় গে। আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। তুমি যদি মানুষ হও তবে এসব গ্লানিতে তোমার কিছু হবে না— তোমাকে যদি এ সবে না ছুঁতে পায় তবে আমার জন্য আমার ভাবনা নেই।" একটা অদ্ভুত হাসি হাসলে সে, হাসির তলায় যেন ব্যথার সাগর! কথাটা ব'লেই চট্ ক'রে ঘুরে সে আপনার ঘরে চ'লে গেল।

আমি নীচে নেমে প'ড়তে গেলাম।

স্কুলে যাবার আগে একটা কথা ব'লতে গিয়ে দেখি মালতী তার ঘরে ব'সে মদ খাচ্ছে। সেই তখন থেকেই খাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল।

আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো।

খুব রাগ ক'রে আমি ব'ল্লাম, "এ কি দিদি? এই বুঝি আমাকে কথা দিয়েছিলে?"

কথা তার জড়িয়ে গিয়েছিল' সে ব'ল্লে, "বেশ্যার কথা—তার এই দাম!" ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠলে।

আমি রেগে তাকে খুব খানিক গালিগালাজ ক'রলাম। সে তখন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ল্লে, "রাগ ক'রছো ভাই—রাগ করো

না। আমি কি ক'রবো ?—কি উপায় আমার বল—মদ না খেলে পারে কেউ—পারে কেউ এইসব সইতে ?" ব'লে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে সে আমায় জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে, "এত দুঃখ কি সওয়া যায় ভাই ?"

আমি আর কথা কইলাম না। আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে তাকে বসালাম। ব'সেই সে হাত বাড়িয়ে মদের গেলাসটা টেনে নিলে। আমি খপ্ ক'রে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিতে গেলাম, সে টানা টানি ক'রলে। এই ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে গেলাসে যে টুকু মদ ছিল প্রায় সবটাই আমার গায়ের উপর ছিটিয়ে প'ড়লো।

গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বোতলটার মদ জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাইরে ঢেলে ফেল্লাম। তার পর মদের আলমারীতে তালা বন্ধ ক'রে আমি খুব বিরক্ত হ'য়ে ইস্কুলে চ'লে গেলাম।

রাগই শুধু হ'চ্ছিল তখন আমার! মালতীর দুঃখটুঃখ সব মেকী—আসলে ও কেবল মাতলামী করবার ওজুহাত, এই রকম মনে হ'চ্ছিল। হয় তো বা অনেকটা তাই—কে জানে ?

রাগে গর্ গর্ ক'রতে ক'রতে ছুটে ইস্কুলে গেলাম। বড্ড দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। হেড্‌মাষ্টার ম'শায় তখন ক্লাশ নিচ্ছেন। মাথা নীচু ক'রে চুপি চুপি ক্লাশে ঢুকে ব'সতে যাচ্ছি, তখন হেড্ মাষ্টার আমাকে দেখতে পেলেন।

খুব কঠোর স্বরে তিনি ব'ল্লেন, "বটুক, এইটা কি স্কুলে আসবার সময় ?"

আমি মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হেড্মাষ্টার আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, তিনি খুব সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু দেখেই চীৎকার ক'রে ইংরাজীতে ব'ল্লেন, "বেরিয়ে যাও ক্লাশ থেকে রাসকেল। বেরোও!"

তাঁর হঠাৎ এতটা রাগ হবার হেতু আমি তখনও বুঝতে পারি নি। তাঁর এ অনাবশ্যক রূঢ়তায় আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। একবার কট্মট ক'রে তাঁর দিকে চাইলাম, তার পর, বেরিয়ে গেলাম।

যখন বেরিয়ে যাচ্ছি তখন রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ব'ল্লেন, "যাও, আফিসে গিয়ে অপেক্ষা কর গে। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি বেরিয়ে গেলাম আফিস ঘরে।

সেখানে দাঁড়িয়ে আছি—আকাশ পাতাল কত কি ভাবছি। আমার উপস্থিত আবেষ্টন সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হ'য়েছে। হেড্মাষ্টার কি ব'লবেন তার সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করছি, আর কোন কথার কি তপ্ত তপ্ত জবাব দেব তার নানারকম মুশাবিদা ক'রছি। হঠাৎ একবার খেয়াল হ'ল, দেখলাম কেরাণী বাবু আর নীচু ক্লাশের একজন মাষ্টার আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ভ্রূকুটি ক'রে কি সব ব'লছেন।

মাষ্টার ম'শায় থুতু ফেলে নাকে কাপড় দিলেন। তার পর মুখ ফিরিয়ে ব'ল্লেন' "দিনে দিনে কি যে হ'চ্ছে তার ঠিকানা নেই—হেড্মাষ্টার বাবু বেত মারতে দেবেন না, বেত নইলে ছেলে দুরস্ত থাকে?—Discipline থাকে? তাইতেই এই সব হ'চ্ছে। আজ

ছেলেরা মদ খেয়ে স্কুলে এসে মাতলামী ক'রছে, কাল মেয়েমানুষ নিয়ে আসবে।"

কথাটা মৃদুস্বরেই ব'লেছিলেন, কিন্তু আমার কাণে গেল।

হঠাৎ চমক ভেঙ্গে গেল। আমি তাড়াতাড়ি আমার কাপড়টা শুঁকলাম—মদের গন্ধ পেলাম। এতক্ষণে বুঝলাম যে আমার গায় মদের গন্ধ পেয়েই হেড্‌মাষ্টার বাবু চ'টে গিয়েছিলেন।

এতক্ষণ রাগ হ'চ্ছিল শুধু—এখন হ'ল ভয়! হেড্‌মাষ্টার বাবু এলে তাঁকে কি ব'লবো? তাঁর সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাৎকারের আশঙ্কায় ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল।

একটু পরেই হেড্‌মাষ্টার বাবু এলেন। গম্ভীর ভাবে আমাকে ব'ল্লেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

আমি নত মস্তকে তাঁর পিছু পিছু তাঁর ঘরে গেলাম।

সেখানে ব'সে তিনি ব'ল্লেন, "তুমি মদ খেয়ে স্কুলে এসেছ—এত বড় সাহস তোমার?"

আমার চোখ জলে ভ'রে গেল—আমি হাত জোড় ক'রে ব'ল্লাম, "স্যর আমি মদ খাই নি—কোনও দিনই খাই না!"

তিনি রেগে ব'ল্লেন, "Nonsense, মিথ্যে কথা ব'লবার চেষ্টা ক'রো না। তোমার মুখে এখনও মদের গন্ধ র'য়েছে!"

আমি ধপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়ে তাঁর পায় হাত দিয়ে ব'ল্লাম, "মিথ্যে বলি নি স্যর, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, মদ আমি খাই নি—খাই না। দেখুন স্যর, গন্ধ আমার মুখে নেই, কাপড়ে শুধু আছে।"

পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখলেন, আমার কথা সত্যি। একটু সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে তিনি ব'ল্লেন, "খাওনি তবে মদের গন্ধ তোমার গায় এলো কি ক'রে ?"

কাতর কণ্ঠে আমি ব'ল্লাম' "একজন খাচ্ছিল, তার কাছ থেকে মদের গেলাস কেড়ে নিতে গিয়ে গায় প'ড়ে গিয়েছিল।"

হেসে তিনি ব'ল্লেন, "এ সেই পুরোণো ওজুহাত—কোন বেটা আমার হাতে ক'রে তামাক খেয়ে গেছে! এতে চ'লবে না! সত্যি কথা যদি বল তবে আমি তোমাকে আর একটা chance দেব—নইলে রাষ্টিকেট ক'রবো! সাবধান!"

"ভগবান জানেন স্যর, একটি কথাও মিথ্যে বলি নি—আপনার কাছে মিথ্যে ব'লবো না। আপনি আমার বাপের বাড়া—আপনি দয়া ক'রেছিলেন ব'লেই লেখাপড়া শিখতে পারছি!"

তিনি একটু পরে ব'ল্লেন, "কে সে? কে মদ খাচ্ছিল?"

এই বারে আমি থমকে গেলাম। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। মালতীর কথা, তার বাড়ীতে আমার থাকবার কথা যদি বলি, তবে সে অপরাধটা যে মদ খাওয়ার চেয়ে কম গুরুতর ব'লে মনে হবে না বুঝতে পারলাম। সেই দিন বাবুর বন্ধুদের সেই কুৎসিৎ ইঙ্গিতের পর থেকে আমার খেয়াল হ'য়েছিল, যে আমি ও মালতী, দিন-রাত্রি এক বাড়ীতে প্রায় একা একা থাকি এ থেকে লোকে স্বভাবতঃ শুধু একটা কথাই মনে ক'রতে পারে—আর কোনও কথা তারা বিশ্বাস করবার কথা নয়। তা ছাড়াও, একটা বেশ্যার বাড়ীতে থাকি, শুধু এই কথাটাই তো স্কুলের ছাত্রের পক্ষে

যথেষ্ট কলঙ্ক! তাই থমকে গেলাম, চট্ ক'রে উত্তর দিতে পারলাম না।

হেড্ মাষ্টার ম'শায় কিন্তু ছাড়লেন না। সব কথাই আমার কাছ থেকে ক্রমে আদায় ক'রে নিলেন। আমি ব'ল্লাম এক রকম ক'রে —ছাঁকা সত্যি যা' তাই। তিনি বুঝলেন অন্য এক রকম ক'রে— যেমন আর সবাই বুঝবে। সব শুনে তিনি গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ল্লেন, "আচ্ছা এখন তুমি বাড়ী যাও, কাল এসো।"

চল্লাম বাড়ী। ইস্কুল থেকে যখন বেরিয়ে যাই তখন ছেলেরা ছুটে এলো, জিগ্ গেস ক'রলে, "কি হ'য়েছে ভাই?"

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। তারা ভীড় ক'রে আমার চার দিকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাড়া তাড়ি ফটকের দিকে এগিয়ে চ'ল্লাম। সবাই ঘিরে চল্‌লো। একজন এসে হাসতে হাসতে ব'ল্লে, "বুঝতে পারলি নে বোকারা, মদ খেয়ে এয়েছে ব'লে ওকে Expel ক'রেছেন।"

আমি কট্মট্ ক'রে তার দিকে চেয়ে ব'ল্লাম, "মিথ্যাবাদী!"

সে তেড়ে এসে ব'ল্লে, "কি এত বড় কথা? আমাকে বলিস মিথ্যাবাদী?—ছোটলোক, শূয়ার!"

আমার মাথায় তখন আগুন জলছিল, "আমি ব'ল্লাম, "তুই ছোটলোক, শূয়ার।"

দম ক'রে ছেলেটা এক ঘুসি লাগিয়ে দিলে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত আমি তার উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে দমাদম কিল

ঘুসি লাগাতে লাগলাম—সেও হিংস্রভাবে আমাকে আক্রমণ ক'রলে।

আর সব ছেলেরা আমাদের ধ'রে তফাৎ ক'রে দিলে। তখনও সে ভয়ানক মুখ খারাপ ক'রে আমাকে গাল দিতে লাগলে।

ব'ল্লে সে, "শালা আমাকে ব'লে মিথ্যাবাদী—শূয়ার! তোর কথা আমি সব জানি—শালা—বেশ্যার ছেলে, বেশ্যার"—

আর ব'লতে দিলাম না। আমি সবার হাত ছাড়িয়ে একেবারে মরিয়া হ'য়ে তার উপর লাফিয়ে প'ড়লাম। জ্ঞান ছিল না আমার তখন। কি যে হিংস্র হ'য়ে গিয়েছিলাম সে বলবার নয়।

শরীরে আমার শক্তি ছিল খুব। তা ছাড়া রাগে একেবারে অন্ধ হ'য়ে গিয়ে এমন ভীষণভাবে তাকে আক্রমণ ক'রলাম যে সে এবং তার সাহায্যের জন্য যারা এসেছিল তাদের হু'তিন জনকে কাত ক'রে ফেললাম। আমারও কাপড় চোপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। আঁচড়, কামড়, কিল, ঘুসিতে মুখের অনেক জায়গা ফুলে বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিল, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরে' পড়ছিল। খেয়াল ছিল না আমার।

ছেলেরা তেড়ে গেল হেড্‌মাষ্টারের কাছে নালিশ ক'রতে, আমি বেরিয়ে গেলাম।

[৯]

যখন বাড়ী ফিরলাম তখন দেখলাম মালতী নেয়ে খেয়ে সুস্থ হ'য়ে বাইরের দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পান চিবুচ্ছে।

তার দিকে তাকিয়ে দেখেই আমি মাথা নীচু ক'রে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে আমার ঘরে গিয়ে ব'সে প'ড়লাম।

মালতী আমার ছিন্ন বসন ও বিকৃত মূর্ত্তি দেখেই ব্যস্ত হ'য়ে ডেকে ব'ল্লে, "বটুক, ও বটুক—কি হ'য়েছে ভাই?" আমি জবাব না দিয়ে ছুটে গেলাম।

একটু পরেই সে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে আমার ঘরের ভিতর ছুটে এলো।

আমাকে দেখেই ব'ল্লে, "ইস্, খুন করে ফেলেছে!" আমার ঠোঁট কেটে রক্ত প'ড়ছিল তখনও; আর মুখে আরও আঘাতের দাগ ছিল। তাড়াতাড়ি সেই সব ক্ষত পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে সে ব'ল্লে, "কি হ'য়েছে ভাই? কে মেরেছে তোকে?"

"মারে নি কেউ, আমিই মেরেছি।" ব'লে আমি গোঁজ হ'য়ে ব'সে রইলাম।

মালতী ছুটে গিয়ে জল আর খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে এলো। মুখটা ধুয়ে দিলে, আঘাতের স্থানগুলিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জল দিতে লাগলো—তার মুখভরা ছিল একটা করুণ স্নেহের ব্যস্ততা!

সে ব'ল্লে. "কি হ'য়েছে? কার সঙ্গে মারামারি হ'ল? এত শীগ্‌গির ফিরেই বা এলে কেন?"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি ব'ল্লাম, "আমি ব'লবো না।"

মালতী আদর ক'রে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ব'ল্লে, "কেন ভাই, আমার উপর রাগ ক'রেছ?"

"না তা নয়। কিন্তু আমার দুঃখের কোনও কথা আর কোনও দিন তোমার কাছে ব'লবো না। ব'ললেই তো তুমি সেই অছিলায় আবার মদ খেতে স্নুরু ক'রবে।"

একটু লজ্জিতভাবে মালতী ব'ল্লে, "না ভাই আমি কথা দিচ্ছি আমি তা' ক'রবো না। তা ছাড়া মদের চাবী তো এখন তোমার কাছেই। বল ভাই লক্ষ্মীটি।"

যতই মুখে বলি ব'লবো না, আমার মনটা সত্যি সত্যি ছট্ ফট্ ক'রছিল আমার সব দুঃখ মালতীর কাণে ঢেলে দেবার জন্য। সে ছাড়া এ জগতে আমার বন্ধু কেউ নেই, স্নেহ কারও কাছে কোনও দিন পাই নি; তাই দুঃখের বোঝা তার কাছে ঝেড়ে ফেলতে না পারলে তার ভারে আমার প্রাণটা দম ফেটে বেরিয়ে যাবে মনে হ'ল।

ব'ল্লাম সব কথা। কেঁদে কেঁদে ব'ল্লাম—তারও চোখ জলে ভরে উঠলো।

দু'জনেই তারপর ভাবতে লাগলাম, এর উপায় কি? কোনও উপায় মনে হ'ল না।

হতাশ হ'য়ে আমি ব'ল্লাম, "আমার লেখাপড়া জন্মের মত ঘুচে গেল—মানুষ হ'তে আর পারবো না। হেড্মাষ্টার আমাকে রাষ্টিকেট ক'রবেন—তার পর কি ক'রবো আমি?—তুমি এত ক'রলে দিদি, কিছুতেই কিছু হ'ল না!"

তার ছু'খানা হাত মুখের উপর চেপে ধ'রে আমি কাঁদতে লাগলাম। সে চুপ ক'রে ব'সে চোখের জল ফেলতে লাগলো—কোনও কথাই কেউ ব'লতে পারলাম না।

নিতান্ত ছোট দুটি অনভিজ্ঞ যুবক যুবতী আমরা—আমার বয়েস ষোল, মালতী আমার চেয়ে মাত্র দু-তিন বছরের বড়। মাত্র আঠার উনিশ বছর বয়েস হ'লেও এক দিকে মালতীর জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী হ'য়েছিল, কিন্তু সেই গণ্ডীর বাইরে, পৃথিবীকে চেনে জানে সে আমার চেয়েও কম। তাই একটা বিশাল ঝটিকাক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ভিতর দুটি অসহায় শিশুর মত আমরা শুধু ছট্ ফট্ ক'রে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম—কূল কোনও দিকে দেখতে পেলাম না।

অনেকক্ষণ পর মালতী ব'ল্লে, "ভেবে দেখলাম ভাই, আমার এখানে তোমার না থাকাই ভাল। আমার সঙ্গে দেখাও না হ'লেই ভাল।"

বড় দুঃখে কথাটা ব'ল্লে মালতী—ছুরীর মত বুকের ভিতর ব'সে গেল কথা কটা। আমিও বুঝলাম, কথাটা সত্যি—কিন্তু ভাল লাগলো না।

সে আবার ব'ল্লে, "দেখি ভেবে কোনও উপায় হয় কি না? আর কোথাও তোমার থাকবার জোগাড় ক'রতে পারি কি না?"

ব'লে সে উঠ্‌লে। উঠে আবার ব'ল্লে, "যাই হোক, বিদায় তোমায় দিতে হবে আমার। ছোট ভাইটি আমার—তোমায় আর রাখতে পারলাম না।"ব'লে সে কেঁদে ফেললে।

আমি কাতর হ'য়ে উঠে দাঁড়ালাম। তার হাত ধ'রে ব'ল্লাম, "কেন পারবে না দিদি? তোমায় ছেড়ে আমি যাবনা—তাতে আমার যা' হয় হোক। আর এখন গেলেই বা কি হ'বে? যা হবার হ'য়ে গেছে। কাল আমাকে রাষ্টিকেট ক'রবে নিশ্চয়—তারপর, তোমার কাছে থাকা না থাকায় কিছু ব'য়ে যাবে না। আমি তোমাকে ছাড়বো না।"

সে ব'ল্লে, "তবু ছাড়তে হবে ভাই! আমার মত লোকের সঙ্গে মিশে থাকলে তোমার কোনও দিকেই কিছু হবে না—হয়তো শেষ পর্য্যন্ত তাতে তোমারই সর্ব্বনাশ হ'বে। যে পাঁকের ভিতর আমি ডুবে র'য়েছি তাতেই হয় তো তোমাকেও ডুবতে হবে। আমি আজ সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে আর আটকে রাখবো না।"

আমার মাথায় নানারকম অসম্ভব কল্পনার প্রচণ্ড স্রোত তাড়াতাড়ি ব'য়ে গেল—অনেক কথা মনে হ'ল। আমি ব'ল্লাম, "তার চেয়ে দিদি, তুমিই পাঁক থেকে বেরিয়ে এসো না। চল আমরা দুটি ভাইবোন বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে হাতে হাত ধ'রে। লেখাপড়া হোল না, নাই হ'ল। হাত পা আছে খেটে খাব—ভিক্ষে ক'রেই না হয় খাব, তবু ধর্ম্মপথে থেকে দু'জনে এক সঙ্গে থাকবো।"

কান্নার ভিতরও মালতী একটু হাসলো। সে ব'ল্লে, "তা হ'লে

লোকে কি ব'লেবে? বাবুরা সেদিন যা' ব'লছিল, ঠিক তাই ব'লবে না? আমার বোঝা কাঁধে নিয়ে তুমি সাঁতরে উঠতে পারবে না, ডুবেই মরবে। যতই যা বল, আমার যে কলঙ্ক আছে একে ঝেড়ে ফেলে মুক্ত না হ'লে তোমার উপায় নেই।"

কথাটায় আমি দমে' গেলাম। লোকে কি ব'লেবে, সে সম্বন্ধে আমি এখন অনেকটা বেপরোয়া হ'য়েছি, কিন্তু তখন সেই উঠন্ত যৌবনে ওটা একটা মস্ত বড় জুজুর মত ছিল। মনে হ'ল মালতী যা' ব'লেছে তা' ঠিক!

কোনও উত্তর ক'রতে পারলাম না। ঘাড় হেট ক'রে ভাবতে লাগলাম।

শেষে মালতী ব'ল্লে, "যাক গে, খুব হুড়োমুড়ি ক'রে কিছু ক'রে দরকার নেই। দেখি আমি চেষ্টা ক'রে—কিছু মোটা রকম টাকা যদি যোগাড় ক'রতে পারি, তবে আর কোনও দুঃখ থাকে না।"

"টাকা! টাকা দিয়ে কি হবে?"

হেসে সে ব'ল্লে, "তোমাকে দেব। এক হাজার টাকা যদি দিতে পারি, তবে আমি তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হব।"

"এক হাজার টাকা! পাগল হ'য়েছ?"

সে ব'ল্লে, "দেখি।"

ব'লে সে ভাবতে ভাবতে চ'লে গেল।

সে চ'লে গেলে বাইরের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম উড়ে মালীটা তফাৎ থেকে আমাদের লক্ষ্য ক'রছে একটু আগ্রহের সঙ্গে।

দেখে আমার ভারী রাগ হ'ল। আমি কট্‌মট্‌ ক'রে তার দিকে চাইলাম—সে সরে' গেল।

পরের দিন হেড্‌মাষ্টার আমাকে ব'ল্লেন যে পরীক্ষা সন্নিকট, এখন তিনি আমার সর্ব্বনাশ ক'রতে চান না, কিন্তু আমাকে ইস্কুলেও তিনি রাখতে পারেন না। আমি আর ইস্কুলে যেতে পাবো না। টেষ্ট পরীক্ষাও দিতে হবে না। কিন্তু অমনি তিনি আমাকে পরীক্ষা দিতে দেবেন।

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। হেড্‌মাষ্টার ম'শায়ের দয়ায় আমার বুক ভরে' গেল। সজল নয়নে আমি ব'ল্লাম, "স্যর, কি আর বলবো ? আপনি যা দয়া ক'রলেন এই আমার ঢের।"

এখন পৃথিবীর অনেক খবর রাখি ; এখন মনে হয় হেড্‌মাষ্টার যে আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়েও তাড়ালেন না, পরীক্ষা দিতে দিলেন, সেটা কেবল নিরবচ্ছিন্ন দয়ার বশে নয়। আমি খুব ভাল ছেলে, পরীক্ষায় একটা উঁচু গ্রেডের স্কলারশিপ নিশ্চয় পাব—আমার কৃতিত্বে স্কুলের একটু খাতির হবে, এ লোভটা তিনি ছাড়তে পারেন নি। তবে হয় তো দয়াও এর ভিতর অনেকটা ছিল।

আমি নাচতে নাচতে বাড়ী গিয়ে মালতীকে ব'ল্লাম, সে শুনে খুব খুসী হ'য়ে গেল।

সে ব'ল্লে, "যাক উপস্থিত তবে আর কোনও গোলমাল ক'রে দরকার নেই—যেমন আছ তেমনি থাক এ তিন মাস। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা ক'রতে পারবোই। এখন তুমি আর কোনও ভাবনা চিন্তা ক'রো না—প্রাণপণ ক'রে শুধু প'ড়ে যাও।

আমি সত্যি সত্যিই প্রাণপণ ক'রে প'ড়তে লাগলাম। মালতীও প্রাণপণ ক'রে আমার সাহায্য ক'রতে লাগলো, যাতে আমার পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত না হয় সেই চেষ্টা ক'রে। এমন কি পরীক্ষার দিন পর্য্যন্ত সে এক দিনও দিনের বেলায় মদ ছোঁয় নি, রাত্তিরেও বোধহয় খুব সামান্যই খেয়েছে। যাতে আমার মনে কষ্ট হ'তে পারে এমন কোনও কিছুই সে হ'তে দেয় নি।

আমার সঙ্গে দেখা শোনা কথাবার্ত্তা রোজ হ'য়েছে—কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। আর কথাবার্ত্তার মধ্যে বেশীর ভাগ শুধু আমার পড়াশোনারই কথা।

একটা জিনিষ তখন দেখতাম। তখন সেটা বিশেষ লক্ষ্য করি নি, এখন তার তাৎপর্য্য বুঝতে পেরেছি। আমরা যখন কথাবার্ত্তা কইতাম তখন প্রায়ই দেখতাম ঐ উড়ে মালীটা কোথাও না কোথাও তফাতে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া প্রায়ই এখন তাকে বাড়ীর ভিতর এখানে সেখানে দেখা যায়—যা আগে দেখা যেত না। আমি বিরক্ত হ'তাম, কিন্তু কিছু বলিনি কোনও দিন, তাকেও না, মালতীকেও না।

আর একটু সুবিধা হ'য়ে গেল, পরীক্ষার দিন পোনরো আগে। বাবুটির বিশেষ দরকারে নাকি দেশে যেতে হ'য়েছিল; এ কয় দিন তাই তিনি আসেন নি। কাজেই রাত্রের হাঙ্গামা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, রান্নার কাজ থেকেও আমি ছুটি পেয়েছিলাম। শুধু আমার নিজের জন্য হু'বেলা হুটো রাঁধতে হ'ত। মালতী সেটাও আমার পক্ষে যথাসম্ভব সংক্ষেপ ক'রে দিয়েছিল একটা কুকার কিনে।

পরীক্ষার দিন আমি সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে যাবার আগে মালতীর কাছে গিয়ে ব'ল্লাম, "চ'ল্লাম দিদি, আশীর্ব্বাদ ক'রে দাও।"

মালতী আমার জন্য পান সাজছিল। উঠে আমার হাতে পান দিয়ে ব'ল্লে, "যাও ভাই, আশীর্ব্বাদ করি খুব ভালো ক'রে পাশ কর।"

আমি ধপ ক'রে নুইয়ে প'ড়ে তার পায়ের ধুলো নিলাম। সে আমাকে হাত ধ'রে তুলে ব'ল্লে "পাগল!"

আমি ব'ল্লাম, "এতে দোষ নেই দিদি, তুমি যে আমার দিদি।"

হেসে ব'ল্লে, "না ভাই দোষ কি? হাজার হোক বামুনের মেয়ে তো আমি?"

"বামুনের মেয়ে! এত দিন তো সে কথা বল নি আমায়।"

"জানতাম না তাই বলি নি; এবারে মার কাছে শুনলাম আমার বাবার নাম। এত দিন বলে নি। এবার বড্ড চেপে ধ'রেছিলাম তাই ব'ল্লে,।"

মালতীর মা তীর্থ ঘুরে এসে এখন কালীঘাটে একখানা ঘর নিয়ে আছেন। মালতী দু'এক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেছে। কালও গিয়েছিল।

আমি ব'ল্লাম, "তাই নাকি? কি নাম তাঁর—তাঁদের বাড়ী কোথায়?"

"সে সব শুনো'খন পরে, এখন এস, তোমার বেলা হ'য়ে গেল।"

পরে শুনেছিলাম মালতীর বাবার নাম রাখালদাস চাটুয্যে।

আমি আবার পায়ের ধুলো নিলাম। মালতী ব'ল্লে, "জয় হোক ভাই, ভাল হও, বড় হও, মানুষ হও।"

ব'লে আমাকে তুলে নিয়ে দু'হাতে আমার মাথাটা চেপে ধ'রে আমার কপালের মাঝখানে একটা চুমো খেলে।

ভারী লজ্জা হ'ল আমার, কিন্তু স্নিগ্ধ হ'য়ে গেল সমস্ত শরীর। মনে হ'ল মার কথা! বাড়ী থেকে আসবার দিন তিনিও আমায় এমনি ক'রে চুমো খেয়েছিলেন! একটিবারও মনে হ'ল না যে পয়সার বিনিময়ে মালতীর ঐ মুখ কত না কলঙ্কের ছাপ অম্লান বদনে গ্রহণ করে কত চুম্বন বিক্রি করে। কোনও গ্লানির কথা মনে এলো না।

পবিত্র স্নেহের এই বিজয় টীকা কপালে ধারণ ক'রে আমি পরীক্ষা দিতে গেলাম।

যে ক'দিন পরীক্ষা দিলাম, রোজই যাবার সময় এ আশীর্ব্বাদ পেতাম।

[১০]

সেনেট হাউসে আমার সীট প'ড়েছিল। পরীক্ষা খুব ভালই দিচ্ছিলাম।

শেষের দিন পরীক্ষা দিয়ে যখন বের হ'চ্ছি তখন মনটা ভারী উৎফুল্ল। কোনও দিনই কোনও প্রশ্ন বাদ দিইনি, আর সবগুলিই বেশ ভাল লিখেছি। একটা ভাল রকম স্কলারশিপ পাব এই আশায় মনে ভারী আনন্দ হ'চ্ছিল।

ঠিক ক'রেছিলাম আজ মাকে চিঠি লিখবো। পোষ্টকার্ড কিনে এনেছিলাম। এগ্‌জামিন শেষ হ'লে সেনেট হলের বারান্দায় ব'সে চিঠিখানা লিখে আমি চ'ল্লাম ডাকে ফেলতে।

এতদিন দুঃখিনী মার কথা খুবই মনে হ'য়েছে আমার ;কিন্তু চিঠি লিখতে সাহস হয় নি। পাছে চিঠি লিখলে মামা কোনও মতে সন্ধান পেয়ে আমার ঠিকানা জানতে পারেন। জানতে পারলে মামা আমাকে আবার টেনে নিয়ে যাবেন এই রকম একটা ভয় আমার গোড়ায় ছিল। তার পর আর একটা সঙ্কোচ হ'ল পরে, যখন সব জানতে পারলাম। আমি এমনি একটা জায়গায় আছি এ খবর যদি মা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন তবে গলায় দড়ি দেবেন। তাই লিখি নি।

আজ পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে। খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছি—হয়তো স্কলারশিপ পেয়ে পাশ ক'রবো—আর, এখন একবার বাড়ী যাব, এ খবরটা মাকে না দিয়ে পারলাম না। বিশেষতঃ, দিন দুই তিনের ভিতরই বাড়ী রওনা হব। এর মধ্যে কিছু জানাজানি হবার কথা নয়—বিশেষ যখন ঠিকানাটা আমি চিঠিতে লিখলাম না।

মার সঙ্গে এতদিন পর দেখা হবে। আমি ম্যাট্রিক দিয়েছি, ভাল ক'রে পাশ ক'রবো এ সব শুনে মা কত খুসী হ'য়ে যাবেন; এতদিন আমার খোঁজ খবর না পেয়ে তিনি না জানি কত কি ভেবেছেন, কত দুঃখ হয়তো পেয়েছেন!—এখন এ সব শুনে আর আমাকে দেখে একেবারে হাতে স্বর্গ পাবেন, এই সব ভাবতে আমার ভারী আনন্দ হ'ল। আমি মনে মনে সেই সব স্বপ্ন রচনা ক'রতে ক'রতে পায় পায় চ'লতে লাগলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে পোষ্টাফিসের দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ যেন মালতী দিদির ডাক শুনলাম, "বটুক!"

আমি বিস্মিত হ'য়ে চারদিক চাইতে লাগলাম। দেখি রাস্তার পাশে একখানা ঠিকে গাড়ীতে ব'সে আছে মালতী—একা।

সে আমারই প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ ধ'রে এখানে গাড়ী ক'রে ব'সে র'য়েছে।

তাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। তার গয়না পত্র যা' সে সর্ব্বদা পরে তাও কিছু নেই—বিধবার মত হাত দুখানা খালি—পরণে একখানা আদ্‌ময়লা আটপৌরে সাড়ী; তার উপর একখানা বিছানার চাদর জড়িয়েছে।

আমি ব'ল্লাম, "তুমি এখানে ?"

"তোমারই জন্যে এসেছি। সব কথা পরে ব'লবো। এখন আমি যাচ্ছি। তুমি এই টাকা ক'টা রাখ।—আর শোন—সে বাড়ীতে আর যেও না—কে জানে, হঠাৎ খুন ক'রতে পারে।"

আমি স্তব্ধ হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম, আমার হাতের ভিতর কি গুঁজে দিলে দেখলাম না।

তার পর সে গাড়োয়ানকে ব'ল্লে "চালাও।"

ঠিকে গাড়ীর ঘোড়া গা মোড়া দিয়ে চ'লতেও দু' দণ্ড লাগে। তার ভিতর আমার চমক ভাঙ্গলো। আমি গাড়ীর হাতল ধ'রে ব'ল্লাম, "কোথায় যাচ্ছ তুমি এখন ?"

"এখনও ঠিক নেই, ঠিক হ'লে জানাব। এখন যাই।"

"কিন্তু কি হ'য়েছে আমায় একটু ব'লে যাও, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।"

গাড়ী চ'লতে আরম্ভ ক'রলো! মালতী আমার হাত সরাবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ব'ল্লে, "বুঝবার দরকার নেই তোমার এখন। তুমি যেও না সেখানে এই পর্য্যন্ত—এখন ছাড়; চাপা প'ড়বে।"

কোচোয়ানকে আমি ব'ল্লাম, "এই, একটু দাঁড়াও—" মালতীকে ব'ল্লাম, "কিন্তু"—

মালতী গাড়োয়ানকে ব'ল্লে, "চালাও—আর দাঁড়িও না চালাও।"

আমি ব'ল্লাম "দাঁড়াও।"

গাড়োয়ান ন যযৌ ন তস্থৌ গোছ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি

ব'ল্লাম, "বেশ, নাই জানলাম কিছু, আমি তোমার সঙ্গে আসি, পৌঁছে দি।"

"না—না—না—কেন অবুঝের মত ক'রছো মিছে মিছি—যাও। নেহাৎ শুনতে চাও শোন—বাবু ঠিক ক'রেছেন যে তুমি আমার—ইয়ে"—

কথাটা সে ব'লতে পারলে না কিছুতেই, কিন্তু আমার বুঝতে বাকী রইলো না।

আমার মাথা ঘুরে গেল, "সর্ব্বনাশ!"

আমি গাড়ীর হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মালতী গাড়োয়ানকে ব'ল্লে চালাও।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ব'ল্লাম, "আসি আমি তোমার সঙ্গে।"

কিন্তু মালতী দু' হাতে ঠেলে আমায় বাধা দিলে। তার পর মহা বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লে, "বুঝতে পারছো না বোকা, কি কেলেঙ্কারী ক'রছো? ঐ দেখ।—যাও!"

যে দিকে সে দেখালে আমি সেই দিকে চাইলাম। সেই ফাঁকে সে দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

আমি যা দেখলাম' তাতে আমিও অমনি সরে' দাঁড়ালাম। গাড়ী চ'লে গেল।

রাস্তায় তখন বিষম ভীড়। ছেলের দল তখনও বেরুচ্ছে। ফুটপাথ লোকে বোঝাই। আমার তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না, নইলে এত লোকের সামনে মালতীর সঙ্গে আড়া আড়ী ক'রে কোচোয়ানকে গাড়ী

থামাতেও ব'লতাম না, জোর ক'রে গাড়ীতে উঠতেও যেতাম না। আমাদের কথাবার্ত্তায় সেখানে লোকে জমে যাচ্ছিল। একটু তফাৎ থেকে দাঁড়িয়ে কতকগুলি ছোকরা আমাদের এই কাণ্ড নিয়ে খুব হাসাহাসি ক'রছিল। আমি চেয়ে দেখলাম তারা আমার স্কুলেরই ছেলে—যাদেরকে আমি মেরেছিলাম, তারাই আর সবাইকে টেনে এনেছে দেখাতে।

আমি ফিরে তাদের দিকে তাকাতেই সেই ছোকরারা আমাকে টিটকারী দিয়ে এমন সব বিশ্রী কথা ব'লতে লাগলো যে আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে লাগল।

আমি দুই হাতে মুষ্ঠি চেপে ধ'রে কট্‌ মট্‌ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইলাম। তারাও লড়বার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

এমন সময় ট্রাম থেকে নেমে, হেড্‌ মাষ্টার ম'শায় আমাদের মাঝখানে এসে ঐ ছেলেদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কিহে কেমন লিখলে তোমরা ?"

অমনি তারা সব শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক হ'য়ে দাঁ'ড়াল। প্রশ্ন পত্র নিয়ে হেড্‌ মাষ্টারের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলে।

আমি হেড্‌ মাষ্টারকে দেখে স'রে গেলাম।

খানিক দূরে গিয়ে খেয়াল হ'ল যে হাতের ভিতর কি যেন আছে। দেখলাম, মাকে লেখা সেই চিঠিখানা আর মালতীর দেওয়া তিনখানা নোট, একেবারে কুঁচকে গেছে। সেগুলো পাট ক'রে দেখতে পেলাম, মালতী দিয়েছে একশো টাকার তিনখানা নোট—তিন শ' টাকা।

যত্ন ক'রে টাকাটা পকেটে পুরে, চিঠিখানা বাক্সে ফেলে দিলাম।

তারপর ছুটে গেলাম কালীঘাটে—মালতীর মার কাছে—তার ঠিকানাটা জানা ছিল।

দেখলাম মালতীর মা কিছুই জানে না। সে একেবারে আকাশ থেকে প'ড়লো। সে ব'ল্লে "কোথায় গেল আবাগীর বেটী?"

আমি তার সঙ্গে বেশী কথা কইলাম না। কথা কইবার রুচি ছিল না। মা হ'য়ে মালতীর যে সর্ব্বনাশ হতভাগিনী ক'রেছে তাতে তার উপর আমার ক্রোধ ও ঘৃণার পরিসীমা ছিল না।

পারলাম না আমি থাকতে—ছুটে গেলাম মনোহর পুকুরের সেই বাগান বাড়ীতে।

গিয়ে দেখলাম, বাড়ীতে তালা বন্ধ, সেখানে কেউ নেই। উড়ে মালীটা শুধু দূর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে।

সে চেঁচিয়ে ব'ল্লে, "দেখছো কি ঠাকুর? তোমার পাখী উড়ে গেছে।"

তার কথার কুৎসিৎ ভঙ্গী ও ইঙ্গিতে বিরক্ত হ'য়ে গেলাম। তার কাছে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না। তবু ছু' একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম। সে এমন একটা ঠাট্টার সুরে অশ্লীল কথা ও ইঙ্গিত সহকারে তার উত্তর দিলে যে তাতে আমার বিষম রাগ হ'ল—তা ছাড়া কথাও বিশেষ কিছু জানতে পারলাম না। জানলাম শুধু এই যে বাবু আজ দেশ থেকে ফিরে এসে ছুপুর বেলায় এখানে এসেছিল। তার পর মালতীকে মার ধোর ক'রে গয়না পত্র কেড়ে নিয়ে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পথে বের ক'রে দিয়েছে। এই অদ্ভুত কাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কোনও কথাই সে ব'ল্লে না।

বিরক্ত হ'য়ে ফিরলাম। পথে যেতে যেতে দেখা হ'ল ঝির সঙ্গে। তার কাছে কথাটা শুনলাম। যা শুনলাম আর পরে যা জানতে পেরেছি তা' থেকে সমস্ত ব্যাপারটা এখন বুঝতে পেরেছি।

বাবুর বন্ধুরা সেদিন আমার সঙ্গে মালতীর নাম জুড়ে দিয়ে যখন ইয়ারকী ক'রছিলেন তখন হঠাৎ বাবুর মনে সত্যি সত্যি আমার সম্বন্ধে সন্দেহ হ'য়েছিল। তার পর বাবু ঝিকে ও মালীকে আমাদের দুজনকে বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে তাঁকে খবর জানাতে ব'লে গিয়েছিলেন, আর তা ছাড়া আমরা কোথাও গেলেও পিছু পিছু যাবার জন্য লোক নিযুক্ত ক'রেছিলেন। তাইতেই মালীটাকে পরে আমি হঠাৎ অত ঘন ঘন আমাদের মাঝখানে দেখতে পেতাম।

আমার সঙ্গে কথায় মালতী যেদিন ব'লেছিল যে কিছু মোটা টাকার জোগাড় হ'লেই সে আমাকে মুক্তি দিতে পারে, তার মাসখানেক পর বাবু চ'লে গেলেন বাড়ীতে। মালতীও সেই সময় তিন চার বার তার মার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিল। আসলে সে মার কাছেই শুধু যায় নি, গিয়েছিল অন্য জায়গায়, গোটা কয়েক দালালের সঙ্গে দেখা ক'রতে।

মালতী গান বাজনা বেশ ভাল শিখেছিল। বাবুর যে সব বন্ধুরা এখানে আসতেন তাদের মুখে মুখে তার গানের খ্যাতি বেশ র'টে গিয়েছিল। তাই দালালদের পক্ষে কাজটা কঠিন হয় নি। একটা খুব বড় লোকের ছেলে একদিন মালতীকে বাগানে নেবার জন্য বেশ মোটা টাকা বায়না ক'রলে।

আমার পরীক্ষার ভিতরই একদিন মালতী বৈকাল বেলায় বেশ

সাজগোজ ক'রে একটা ছোট তোরঙ্গ নিয়ে গাড়ী ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমাকে ব'লে গেল মার কাছে যাচ্ছে, দেরী হয় তো রাত্রে নাও আসতে পারে। বাবু তখনও দেশে। সেদিন সে মার কাছে যায় নি, গিয়েছিল সেই বাগানে। সেখান থেকে দালালদের দিয়ে থুয়ে চার শ' টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছিল, পরের দিন সকাল বেলায়।

দালালকে দিয়ে এমনি আরও দুইদিন যাবার বায়না সে ক'রেছিল,—আমাকে হাজার টাকা পুরিয়ে দেবার জন্য। তাই সেদিন যখন আমি তার কাছে প্রণাম ক'রতে যাই তখন সে অন্য দিনের চেয়ে বেশী প্রফুল্লভাবে আশীর্ব্বাদ ক'রেছিল।

আমি চ'লে গেলাম পরীক্ষা দিতে। বাবু সেই দিনই সকালে ফিরে এলেন ক'লকাতায়। মালী গিয়ে তাঁকে আমার সঙ্গে মালতীর সন্দিগ্ধ সম্পর্কের কথা ব'ল্লে। আর অন্য চরেরা গিয়ে দিলে বাগানের খবর। বাবু একেবারে মার মূর্ত্তি হ'য়ে ছুটে এলেন মনোহর পুকুরে।

নির্দ্দয়ভাবে মালতীকে মার ধোর ক'রে তিনি শেষে তার গয়না পত্র কাপড়-চোপড় কেড়ে রেখে তাকে রাস্তায় বের ক'রে দিলেন।

মালতী কাতর হ'য়ে ভিক্ষা ক'রলে দু'খানা কাপড় শুধু সঙ্গে নেবার জন্য। বাবু হুকুম দিলেন, মালতী আর বাড়ী ঢুকতে পাবে না, ঝিকে দিয়ে কাপড় নিতে হবে।

ঝিকে ডেকে মালতী তার একটা চাবী দিয়ে গোপনে ব'লে দিলে যে কাপড়ের তোড়ঙ্গের তলায় চারখানা একশো টাকার নোট আছে।

দু'খানা কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে সেই নোট ক'খানা আনতে ব'লে দিলে—ব'ল্লে, "আনতে পারলে একখানা তোর।"

ঝি আনলে টাকা। একখানা নোট তাকে দিয়ে বাকী তিনখানা নিয়ে মালতী বেরিয়ে পড়লো। ঠিকে গাড়ী ক'রে সে চ'লে গেল আমার সন্ধানে।

এমনি ক'রে আত্মবিক্রয় ক'রে সে আমার জন্য অর্থসংগ্রহ ক'রতে গিয়ে সর্ব্বস্ব হারাল আর তার পর যথা সর্ব্বস্ব সে আমাকে দিয়ে রিক্ত হস্তে চ'লে গেল। গাড়ী ভাড়া দেবার পয়সাও তার সঙ্গে বোধ হয় নেই।

শুনে আমি ব'সে প'ড়লাম।

মালতীকে এতদিন খুব কাছে থেকে দেখেছি—ভালও বেসেছি, কিন্তু কত যে মমতা, কত মহত্ত্ব তার ভিতর আছে তা এতদিনও ভাল ক'রে বুঝতে পারি নি। আজ তার সবটা যেন আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো।

মালতী বেশ্যাবৃত্তি করে, কিন্তু তাতে তার রুচি নেই। ধর্ম্ম বা নীতিজ্ঞানের বাধা এ বিষয়ে তার ভিতর খুব বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু শরীর বিক্রয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরক্তি ছিল, আর এক সঙ্কোচের কারণ ছিলাম আমি। যতদিন সে ভবানীপুরে ছিল ততদিন এ বিরক্তিটা তত প্রবল হ'তে পারে নি, মনোহরপুকুরে এসে সেটা খুব বেশী হ'য়ে ছিল। মদ খেয়ে সে এ বিরক্তি জয় ক'রতো,—নইলে তার পক্ষে এ ব্যবসা অসম্ভব হ'ত।

কিন্তু তার অন্তরে ছিল এক মহানারী—সে সত্তা তার আত্ম-

প্রকাশের অবসরের অভাবে ক্ষুধিত হ'য়েও অচেতন হ'য়ে ছিল। আমাকে আশ্রয় ক'রে ফুটে উঠেছিল তার এই মহীয়সী নারী মূর্ত্তির একটা প্রকাশ।

সে মূর্ত্তি আজ আমি প্রত্যক্ষ ক'রলাম। সব দোষক্রটি তার ভুলে গেলাম। অভিভূত হ'য়ে গেলাম তার অসীম স্নেহের স্মৃতিতে!

শরীরের ক্ষুধায় সে বিশ্বাসঘাতিনী হয় নি, অর্থলোভেও হয় নি। এ ব্যাপারটার উপর তার এমন একটা বিরক্তি ছিল যে বিশ্বাসঘাতিনী হ'বার ইচ্ছাই তার হ'ত না, তার কল্পনায় সে বিরক্ত হ'য়ে উঠতো।—কিন্তু আমাকে তার পাপস্পর্শ থেকে মুক্ত ক'রে মানুষ ক'রে তোলবার জন্য এ হীনতাও সে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল।

প্রথমে ভারী দুঃখ হ'ল মালতীর দুর্দ্দশা ভেবে। কিন্তু খানিক ভেবে মনে হ'ল, দুঃখ করবার কিছু তো নেই এতে। দু'খানা গয়না গেছে, বাড়ীঘর গেছে, টাকা গেছে—সে তো কিছুই নয়—তার চেয়ে ঢের বড় লাভ তার হ'য়েছে, একটা ঘোর ক্লেদময় পাপের বন্ধন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে—এ আনন্দের কথা।

উঠলাম। বুদ্ধি স্থির ক'রে উঠলাম। মালতীকে খুঁজে বার ক'রবো। তাকে এ পাপ থেকে জন্মের মত মুক্তি দেব।

আমি তাকে খাওয়াব পরাব। যেমন ক'রে পারি খেটে দু'পয়সা রোজগার ক'রবো, ক্ষুদ কুঁড়ো যা পারি খাওয়াব। আমার গৃহে আমার মায়ের পাশে অধিষ্ঠিত ক'রবো তাকে। সেটা সম্ভব হবে কিনা সে হিসাব তখন মনেও আসেনি—ছেলে মানুষ, সংসারের কিই বা জানি তখন।

একটা থাকবার জায়গা ঠিক ক'রে তার সন্ধানে বের হ'লাম। পরের দিন সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গুলো রেখে দিয়ে দিনরাত তার সন্ধানের সূত্র খুঁজে বেড়ালাম।

কোনও সন্ধানই পেলাম না।

পোনেরো দিন বৃথা অন্বেষণ ক'রে তার পর আবার তার মার কাছে গেলাম। তখনও সে তার মাকে কোনও খবর দেয় নি।

হতাশ হ'য়ে ছেড়ে দিলাম সন্ধান। মায়ের কাছে দেশে গেলাম।

দেশে গিয়ে দেখলাম অনেক কাণ্ড হ'য়ে গেছে।

মামীমা বাড়ী থেকে ঝগড়া ক'রে মামার কাছে ক'লকাতায় গিয়েছিলেন। মামীমার নামে গাঁয় নানা রকম কুৎসিত কথা উঠেছিল তাই নিয়ে ঝগড়া। মিথ্যে কথা সব, তবু বিশ্বাস প্রায় সবাই ক'রেছিল। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মামীমা গাঁয়ের একটি কৈবর্ত্তকে সঙ্গে ক'রে ক'লকাতায় মামার কাছে গিয়েছিলেন। তাতেই গাঁয় রটে গিয়েছিল যে মামীমা তার সঙ্গে কুলত্যাগ ক'রেছেন! মামার কাছে তাড়া খেয়ে মামী দেশে আর ফেরেন নি—তাঁর খবরও কেউ জানে না।

মামাও দেশে যান নি আর। অনেক দিন তাঁর খবর না পেয়ে যখন গাঁয়ের একটি লোক ক'লকাতায় তাঁর খবর ক'রতে গেল তখন সে খবর নিয়ে এলো যে কিএকটা ফৌজদারী মামলায় প'ড়ে তাঁর জেল হ'য়েছে। জেলে যাবার মত কি তিনি ক'রেছিলেন জানি না, কিন্তু জেলে যাওয়াটা যে তাঁর উচিত হ'য়েছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয় নি কখনও।

মামার এই বিপদের কথা শুনেই মা অস্থির হ'য়েছিলেন, তার উপর যখন শুনলেন যে আমি কোথায় চ'লে গেছি তা কেউ জানে না, তখন তিনি একেবারে পাগলের মত হ'য়ে গেলেন। তার পর

এক বছর আমার কোনও খবর না পেয়ে তিনি আমার মৃত্যু স্থির ক'রে একেবারে হতাশ হ'য়ে প'ড়েছিলেন।

তাই যেদিন তিনি আমার চিঠি পেলেন যে আমি শুধু বেঁচে নেই, পরীক্ষা দিয়েছি আর হয়তো খুব ভাল রকম পাশ ক'রবো তখন তাঁর কি যে উল্লাস হ'ল তা' বলবার নয়।

আমাকে দেখে মা আমায় বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন—আর আমার নব যৌবনের পরিণত রূপরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর বুক আনন্দে ভ'রে গেল। কি যে তিনি ক'রবেন আমায় নিয়ে তা ভেবে উঠতে পারলেন না। দিন রাত শুধু আমাকে নিয়ে প'ড়ে থাকেন, আমার মুখপানে চেয়ে থাকেন, আমার কথা শোনেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আমার ক'লকাতার জীবনের কথা—কবে কে আমায় দেখে কি প্রশংসা ক'রেচে, তাই জানবার জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই।

মা এই কথাটাই মনে ক'রতে চান যে আমি একটা মস্ত বড়লোক হ'য়েই গেছি। সেই ভাবটাই তাঁর কথায় বার্ত্তায় চাল চলনে ফুটে ওঠে। দেখে আমার গর্ব্ব হয়, আনন্দ হয়—লজ্জাও হয়।

বড় দুঃখ বুকে নিয়ে ক'লকাতা থেকে এসেছিলাম, মায়ের কোলে এসে বুকটা জুড়িয়ে গেল। মাতৃস্নেহের সম্ভোগে আত্মহারা হ'য়ে গেলাম।

মার কাছে অনেক কথাই ব'লেছিলাম, কিন্তু মালতীর কথাটা অনেকদিন পর্য্যন্ত ব'লতে পারি নি। ব'লতে কোনও সঙ্কোচই

হ'ত না আমার যদি শেষে এতগুলো কাণ্ড হ'য়ে না যেত। সেই যে বাবুর বন্ধুরা ইঙ্গিতটা ক'রেছিল সেই দিন থেকে আমার প্রথম খেয়াল হ'য়েছিল যে আমার সঙ্গে মালতীর স্নেহ সম্পর্কটা লোকে কুভাবেই দেখবে হয়তো। তার পর দেখলাম হেড্ মাষ্টার ম'শায়ের মনের ভাবটাও সেই রকম। আর শেষে যে ভয়ানক কাণ্ডটা হ'য়ে গেল আমাদের এই স্নেহ সম্বন্ধ নিয়ে, তাতে তো আর সন্দেহের কোনও অবসরই রইলো না। তাই, তার পর থেকে আমার এ সম্বন্ধে খুব বেশী একটা সঙ্কোচ এসে প'ড়েছিল—মার কাছেও কথাটা ব'লতে সাহস হয় নি।

মাকে প্রথমে ব'লেছিলাম যে মামার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ী রান্না ক'রে থাকতাম আর স্কুলে প'ড়তাম। শুনে মার চোখ জলে ভরে' উঠলো। তিনি ব'ল্লেন, "আহা বাছা আমার, কত কষ্টই তুই পেয়েছিস!"

আমি হেসে ব'ল্লাম, "যা ভাবছো তা নয় মা। কষ্ট মোটেই পাই নি। নামে রাঁধুনী ছিলাম, একবেলা রাঁধতাম, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ছিলাম বাড়ীর ছেলের মত। গিন্নী যিনি, তাঁকে ব'লতাম দিদি আর তিনি আমায় ভাল যা বাসতেন আর যে আদরে রাখতেন—সে ঠিক ছোট ভাইটির মত।"

মা হেসে ব'ল্লেন, "তা না ক'রবে কেন? আমার এ সোণার চাঁদ ছেলেকে যে দেখবে সেই আদর ক'রবে—না ক'রে যাবে কোথায়?"

আমি হেসে ব'ল্লাম, "তোমার দাদা কিন্তু একটি দিনও আদর করে নি মা।"

"সে হতভাগার কথা মুখে এনো না। জেলে গেছে বেশ হ'য়েছে। তোর যে সর্ব্বনাশ ক'রছিল তার শাস্তি হ'য়েছে। ভগবান তো আছেন!"

কথাটা শুনে আমার মনে প'ড়লো মালতীর কথা—যার জন্য আমার মনটা ব্যথায় টন্ টন্ ক'রছিল; আর মনে প'ড়লো মামীমার কথা—তাঁর জন্যও মনটা বড় ব্যথাতুর হ'য়েছিল। মালতী যে এত দুঃখ পেলে—সে শুধু আমাকে ভাইয়ের মত স্নেহ ক'রেছিল ব'লে, তার কোনও পাপে নয়। মামীমার যে দুর্ভাগ্য তার জন্যও তাঁর কোনও দোষ ছিল না। বড় দুঃখ হ'ত আমার তাদের কথা ভেবে। মার কথা শুনে আমার মনে ভরসা হ'ল ভগবান তো আছেন—তাদের এ দুঃখ থাকবে না!

আমার সম্বন্ধে কোনও কথাই মাকে শুধু একবার ব'ল্লেই লেঠা চুকে যায় না। বার বার ক'রে সব কথা তাঁর শোনান চাই। তাই আমার আশ্রয় দাতার কথাটা তিনি রোজ রোজই খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন। আমারও সে কথা ব'লতে কুণ্ঠা ছিল না, তৃপ্তিও ছিল না। শতমুখে মালতীর স্নেহ ও প্রীতির কথা ব'লে যেতাম।

একদিন মা ব'ল্লেন, "আমার সাতজন্মের মেয়ে ছিল সে বাবা তাই সে এমন ক'রেছে—ভগবান তার মঙ্গল ক'রবেন।"

আমি কায়মনোবাক্যে মায়ের এই আশায় যোগ দিলাম। কিন্তু বুক কেঁপে উঠতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে, নিদারুণ আশঙ্কায়! কোথায় আছে এখন মালতী? কি অবস্থায় আছে? ভাবতে লাগলাম।

মা ব'ল্লেন, "হাঁরে তারা কি বামুন ?"

ব'ল্লাম "হাঁ, মা।"

ব'লেই মনটার ভিতর খচ্ খচ্ ক'রে উঠলো। মিছে কথাটা ব'ল্লাম মার কাছে! কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হ'লেও তার তাৎপর্য্যার্থে সে যে মিথ্যা সেটা মনের কাছে লুকোতে পারলাম না।

রোজ রোজ মা এমনি নূতন নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন, কূট প্রশ্ন ক'রে সত্যি কথা জানবার চেষ্টায় নয়—শুধু আমার মুখে আমার হিতকারীদের কথা বার বার শোনবার আনন্দে। কিন্তু তাতেই শেষ পর্য্যন্ত আর ছলনা চ'ললো না। সব কথা খুলে ব'ল্লাম মার কাছে।

শুনে প্রথমে মা ভয়ানক সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলেন—এই ভেবে, যে বুঝি বা আমি মালতীর সংসর্গে প'ড়ে জাত খুইয়ে ব'সে আছি। যখন তাঁর গা ছুঁয়ে শপথ ক'রলাম যে আমি জাতিপাতকর কিছুই করি নি, তার হাতেও খাই নি, ছোঁয়াও খাই নি,—তার ছোঁয়া জলটুকু পর্য্যন্ত খাই নি, তখনি তিনি আশ্বস্ত হ'লেন।

আমি ভেবেছিলাম মা হয় তো কথাটা শুনে ভয়ানক রাগ ক'রবেন। দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম যে রাগ তিনি মোটেই ক'রলেন না। তিনি বরং মুচকে হাসলেন; তার কথাবার্ত্তার ভাবে এইটাই মনে হ'ল যে তিনি মনে করেন যে অভাগিনী মালতী তাঁর ছেলের চাঁদ মুখের মোহে মুগ্ধ হ'য়েছে। তাতে রাগ বা দুঃখ বা শঙ্কা তাঁর হ'ল না, হ'ল তাঁর ছেলের রূপের জন্য একটা প্রচণ্ড গর্ব্ব!

তিনি শেষে একদিন ব'ল্লেন, "যা'ক, যা ভেবেই যা' করুক সে আমার ছেলের মঙ্গল ক'রেছে, তাকে আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি। কিন্তু তুই আর যাসনে তার কাছে।"

আমি ব'ল্লাম, "কি যে ভুল বুঝছো তুমি মা। তুমি যা ভাবছো সব ভুল। মালতীদি সে রকমই নয়—দেখতে যদি তবে বুঝতে।"

হেসে মা ব'ল্লেন, "ছেলে মানুষ তুই, কি বুঝবি ঐ সব মেয়ে-মানুষদের কথা। ওরা যে মায়াবী! তুই যাস নে আর তার কাছে—এই আমি ব'লছি।"

ভয়ানক রাগ হ'ল আমার মার কথা শুনে—প্রতিবাদ ক'রলাম আরও! দেখতে পেলাম যে যতই আমি প্রতিবাদ ক'রছি ততই যেন মার মনে কথাটা আরও শক্ত হ'য়ে ব'সে যাচ্ছে। মার স্বভাবটা এই যে তাঁর মনে যে কথাটা হয় কেউ তাঁকে তা' থেকে টলাতে পারে না—যুক্তি তার যতই থাকুক। শেষে হার মেনে আমি চুপ ক'রে গেলাম। ভারী দুঃখ হ'ল মনে—মাও বুঝতে পারলেন না ঠিক। বাইরের লোক যে বুঝবে না সে আর বিচিত্র কি?

মালতীর কথা এখন আমি খুবই ভাবতে লাগলাম। কোথায় গেছে সে, না জানি কি ক'রেছে—হয় তো বা ম'রেই গেছে। ভাবতে আমার কান্না পেত!

আর তার কথা ভাবতে গেলেই তার পাশে ভেসে উঠতো মামীমার ছবি! অভাগিনীর কি হ'য়েছে জানি না। হয় তো ম'রেই গেছে। না হয় তো সেও বুঝি মালতীরই মত হ'য়ে আজ র'য়েছে। মালতীকে দেখে আমার মনে হ'য়েছিল তাদের এ জীবন

সুখের নয়—বড় ব্যথা, বড় দুঃখ এতে। তাই মামীমার জন্য আমার ভয় হ'ত, দুঃখও হ'ত।

শুধু দুঃখই হ'ত আমার এদের দুজনের কথা ভেবে। কিছুই এদের ক'রতে পারবো এমন ভরসাও হ'ত না।

কয়েকটা মাস কেবল বাড়ীতে ব'সে অলস ভাবে শুধু ভেবেই কাটিয়ে দিলাম।

পরীক্ষার ফল বেরুলো, নম্বর আনালাম, খুব ভাল ক'রেই পাশ ক'রেছি। স্কলারশিপ পাবার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই রইলো না। খুসী হ'য়ে কিছুদিন পরে ক'লকাতায় চ'ললাম কলেজে প'ড়তে।

সে যে কি আনন্দ তা' বলবার নয়। স্কুল ছেড়ে কলেজে প'ড়তে যেতে সব ছেলেরই বুক ফুলে ওঠে—আনন্দ হয়। আমার তো আরও বেশী ক'রে হ'ল।

স্কলারশিপ লিষ্ট যখন বেরুলো তখন দেখা গেল কুড়িটাকার বৃত্তি পেয়েছি আমি। কাজেই বেশ একটু সোর গোল ক'রেই কলেজে ঢুকলাম আমি—সেই আমি, যে মাত্র ক'বছর আগে মামা আর বিমলীর গোলামী ক'রতে ক'রতে হতাশ হ'য়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম পড়া শুনা করবার আশা।

এ কথাটা খুবই মনে হ'ত—সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত তার কথা যার দয়া ও স্নেহে এই অসম্ভব সম্ভব হ'য়েছে—মনের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠতো একটা নিদারুণ ব্যথা।

কোথায় গেল মালতী দিদি? সে তো জানতেও পারলে না যে তার স্নেহের সাধনা এতখানি সফল হ'য়েছে, আমি ভাল ক'রে

পাশ ক'রেছি, মানুষ হবার পথে পা' দিয়েছি! তা' ছাড়া তার টাকা! যা' দিয়ে সে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গিয়েছিল—তার তো আর দরকার নেই আমার! সেই টাকা নিয়ে সে তো মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে!

এমনি কত কথাই মনে হ'ত।

মা ব'লেছিলেন মালতীর কাছে না যেতে। কিন্তু না যদি যাই, তার খোঁজ খবর যদি না করি সেও তো ঘোর অকৃতজ্ঞতা হবে। মায়ের কথা অমান্য ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না, মানতেও পারলাম না।

গেলাম একদিন কালীঘাটে মালতীর মার কাছে।

বুড়ী—বুড়ী সে নয় ঠিক, তবু বুড়ীই বলি—আমাকে দেখে বিশ্রী রকম ক'রে হাসলে---আমার গা জ্বলে গেল।

হেসে সে ব'ল্লে, "মালতীর খোঁজে এয়েছ?—সে এখানে নেই।"

"কোথায় আছে সে?"

আবার হেসে সে ব'ল্লে, "কি হবে সে খোঁজে বাপু তোমার? তোমার কি পয়সা কড়ি আছে যে তাকে রাখতে পারবে। মাঝখান থেকে নাহক আবার মাথা খাবে তার।"

গা জ্বলে উঠলো। হাসিতে বুড়ীর দাঁতের পাটি বিস্ফারিত হ'য়ে ছিল, মনে হ'চ্ছিল দি' ওগুলো ভেঙ্গে।

ঘেন্না হ'লো তার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক ক'রতে। কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রে দেখলাম, বুঝলাম, কিছুতেই ব'লবে না সে। শেষে জিগ্‌গেস ক'রলাম, "আচ্ছা সে কোথায় আছে নাই ব'ল্লে,; ভাল আছে তো সে, সুখে আছে?"

"হাঁ গো হাঁ, খুব ভালো আছে। আমার ঐ মেয়ে ও আর সুখে থাকবে না? এবার আরও রাজার হালে আছে। তোমার পায় পড়ি তুমি আবার তার কাছে গিয়ে একটা অনর্থ ঘটিও না।"

কথায় বার্ত্তায় বেশ বুঝলাম মালতী কেমন সুখে আছে। যেমন সুখ এরা বোঝে তেমনি সুখে। ভাবলাম সে যে কি সুখ মালতীর তা' আমার জানা আছে। মনে হ'ল মনটা তার বুঝি এতে তেমনি ক'রেই পুড়ে যাচ্ছে, শুধু মদ খেয়ে মনের আগুন নিভিয়ে রাখছে। বড় দুঃখ হ'ল। কিছুই ক'রতে পারবো না আমি তার, সেই ভেবে আমার দুঃখ হ'ল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি ব'ল্লাম, "বেশ নাই ব'ল্লে আমাকে তার কথা। কিন্তু তার সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে ব'লো, আমি খুব ভাল হ'য়ে পাশ হ'য়েছি, কলেজে পড়ছি, জলপানি পেয়েছি। সে আমাকে যে টাকা দিয়েছে সে টাকার আর দরকার নেই,"—

"টাকা দিয়েছে! কত টাকা? বুড়ী অবাক্ হ'য়ে গেল।

"তিন শো টাকা।"

"তিন শো টাকা! আর পোড়ার মুখী আমি দুটো টাকা চাইলে কি মুখ ক'রতো! তা' যাক গে, তোমার টাকার দরকার না থাকে আমার কাছে রেখে যেও আমি দেব'খন তাকে।"

আমি একটু ভেবে ব'ল্লাম, "না, সে না চাইলে আমি দেবো না।"

বুড়ী ভ্রূকুটি ক'রে ব'ল্লে, "সে কি এদেশে আছে যে সে চাইতে যাবে? সে গেছে সেই পাঞ্জাবে—এক রাজা তাকে নিয়ে গেছে!"

পাঞ্জাব! ক'লকাতা ছেড়ে, বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে গেছে সে! মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল।

বুড়ী ব'ল্লে, "টাকা আমার কাছে দিয়ে যেও, আমি পাঠিয়ে দেব!"

আমি অস্বীকার ক'রলাম। বুড়ী চটে উঠলো, ক্রমে গাল দিলে, অশ্লীল ভাষায় কটু কাটব্য ব'লতে লাগলো। আমি স'রে পালালাম।

তার কাছ থেকে স'রে গিয়েই আমার মনে হ'ল কি অধঃপতন হ'য়েছে এই মেয়েটার। ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী—এর না ছিল কি? বিশ বছর আগেও এ ছিল একজন গণ্যমান্য মেয়ে। আর কি হ'য়েছে সে আজ—কি লোভ, তিন শো টাকা পাবার জন্য! কি ভাষা তার?

এমনি কি মালতী দিদিও হবে একদিন? ভাবতে ইচ্ছা হ'ল না।

[১২]

তিন শো টাকা সেভিং ব্যাঙ্কেই জমা রইলো—এই আশায় আমি তা' রাখলাম যে তা' দিয়ে হয় তো মালতীর কোনও দিন কোনও উপকার ক'রতে পারবো।

কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেতাম, কলেজে মাইনে লাগতো না, আর সেকালে ক'লকাতায় থাকবার খরচ এত বেশী ছিল না। আমার বেশ চ'লে যেতো, মাঝে মাঝে মাকেও দু'চার টাকা পাঠাতাম। কিছুদিন পর একটা প্রাইভেট টিউশন ক'রতে আরম্ভ ক'রলাম—বেশ স্বচ্ছল ভাবেই চলতে লাগলো।

আই, এ পরীক্ষা বেশ ভাল ক'রেই পাশ ক'রলাম, স্কলারশিপ পেলাম পঁচিশ টাকা।

এই সময়ে একটা বাড়ীতে একটি ছেলে পড়াতাম। বেশ বড় লোক। গাড়ী ঘোড়া লোকজনের অভাব নেই।

একদিন পড়াতে পড়াতে ডিক্সনারী দেখবার দরকার হ'ল, ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম ভাল কোনও ডিক্সনারী আছে কি না। ছেলেটি নিয়ে এলো একখানা Century Dictionary. তার মলাট খুলেই দেখতে পেলাম তাতে নাম লেখা র'য়েছে" রাখলদাস চ্যাটার্জ্জী এম, বি।" মনের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "ইনি কে ?"

ছেলেটি ব'ল্লে, "আমার জেঠা ম'শায়।"

জানলাম তিনি প্রায় বিশবৎসর হ'ল মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী পুত্র কেউ নেই, তাঁর ওয়ারিশ এরাই। রাখাল বাবুর বিধবা পত্নীর সঙ্গে যে কলঙ্ক জড়িত ছিল সে কথা এ ছেলে জানে না, যারা জানে তারাও প্রকাশ করে না। কিন্তু এক আধটুকু অনুসন্ধান ক'রতে কথাটা জানতে পারলাম।

গোড়া থেকেই অনুমান ক'রেছিলাম, এখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে আমার ছাত্র মালতীর খুড়তুত ভাই।

এদের বিলাস বৈভব দেখে আমার মনটা ব্যথায় টন্ টন্ ক'রতো। মনে হ'ত এর সবই তো মালতীর—অদৃষ্টের ফেরে—তার মায়ের পাপে—মালতী এ সুখ সৌভাগ্যে বঞ্চিত। আজ সে ধর্ম্ম ও সমাজের লাঞ্ছিত তুচ্ছ বারবনিতা—তার প্রকৃত মহাসত্ত্ব আর তার ভিতর প্রকাশ হ'চ্ছে না।

ভাবলাম, এখন মালতী করে কি? এখনও কি মালতী ঠিক তেমনি আছে, না—ভাবতে ভয় হ'ত!

সেই দিন থেকে প্রতিদিন আমি সে বাড়ীর চারিদিকে মালতীর ছায়ামূর্ত্তি দেখতে পেতাম। কল্পনা আমার উধাও হ'য়ে গ'ড়ে তুলতো মালতীর আজকের জীবনের চিত্র কি হ'তে পারতো, যদি তার জন্মাধিকারের ক্ষেত্র থেকে এমনি ক'রে তাকে ছিঁড়ে নিয়ে না যেত তার মা। ওই দোতলার ঘরে সে থাকতো, এই আরাম কেদারায় হয় তো ব'সতো। ঐ হেঁসেলে ঘুরে ফিরে পরম আনন্দে গৃহিণীপনা ক'রতো। স্বামী পুত্র কন্যায় পরিবৃত হ'য়ে কি না আনন্দে

কাটতো তার দিন! ভাবতে ভাবতে তন্ময় হ'য়ে যেতাম, স্বপ্ন দেখতাম যেন সব তাই হ'য়েছে, এই বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে হাসি মুখে মালতী নেমে এসে আমাকে ডাকছে "বটুক ভাই"।

বাস্তবের রূঢ় আঘাতে যখন এ স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যেত তখন প্রাণের ভিতরটা যেন গুঁড়ো হ'য়ে যেত বেদনায়। ছট্ ফট্ ক'রতাম আমি।

পারলাম না চাকরী রাখতে। এ কাজ ছাড়তে হ'ল।

কাজটা ছেড়ে আমি রাগে গর্ গর্ ক'রতে ক'রতে একদিন কালীঘাটে গেলাম শুধু মালতীর মাকে খুব খানিকটা বকে আসবো ব'লে।

গিয়ে দেখলাম সে অসুখে শয্যাগত—যাতনায় ছট্ ফট্ ক'রছে।

মুলতবী রইলো আমার তিরস্কার। কেউ নেই তাকে দেখবার। বড় মায়া হ'ল—হাজার হোক মালতীর মা! তার শুশ্রূষা ক'রতে লাগলাম। ডাক্তার দেখালাম।

বুড়ী ব'ল্লে, "কি ব'ল্লে ডাক্তার?"

আমি ব'ল্লাম, ডাক্তার কি রোগ ব'লেছে আর কি ব্যবস্থা ক'রেছে!

সে ব'ল্লে, "ওর গুষ্টির মাথা। আমার কাছে ডাক্তারী ফলাতে এসেছে। আমার এ ব্যারাম অনেক দিনের। পঁচিশ বচ্ছর আগে হ'য়েছে—তখন চিকিৎসেও হ'য়েছে—তেমন চিকিৎসা আর হ'ল না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে চুপ ক'রলে।

শেষে সে ব'ল্লে, "রাখাল ডাক্তারের নাম শুনেছ, রাখালদাস চাটুর্জ্জে—অমন ডাক্তার জন্মায় নি—সে ক'রেছিল চিকিৎসে।"

আমি ব'ল্লাম, "খুব জানি। আর তিনি যে তোমার কি ছিলেন তাও জানি। তুমি যদি তাঁর নামে চূণকালী দিয়ে না আসতে তবে আজ তাঁরই ঘরে তাঁর খাটে শুয়ে' দশটা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতে পারতে।"

মালতীর মা একটু বিস্মিত হ'য়ে আমার দিকে চাইলে। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলে।

শেষে সে ব'ল্লে, "এ ডাক্তার কিচ্ছু বোঝে নি, এর ওষুধে কিছু হবে না। তুমি আমাকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে দিয়ে আসতে পা'র ?"

"ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল ?—অতদূরে কেন ? চল না এই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে রেখে আসি।"

ঘাড় নেড়ে বুড়ী ব'ল্লে, "ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে পার তো যাই—আর কোথাও নয়।"

নিয়ে গেলাম ক্যাম্বেলে। সেখানে তাকে রেখে মেসে ফিরিলাম।

একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম! "এখন ব'লবে আমাকে মালতী দিদির ঠিকানাটা দয়া ক'রে ?"

বুড়ী ব'ল্লে, "জানলেও ব'লতাম না—সে পই পই ক'রে বারণ ক'রে গেছে। আর এখন তো জানিই না।"

"জান না ? কেন সে কি সেখানে নেই—পাঞ্জাবে ?"

"যেখানে ছিল সেখানে নেই। সে রাজার কাছ থেকে সে পালিয়েছে —কোথায় গেছে কোনও সন্ধান রেখে যায় নি—শুধু একখানা চিঠি লিখেছে আমায় যে কোথায় থাকে সে পরে হয় তো জানাবে।"

এলাম ফিরে মেসে। আবার একটা নূতন দুশ্চিন্তা হ'ল। এতদিন যা' হ'ক জানা ছিল সে আছে একরকম—এখন সবই অজানা। কোনও বিপদে প'ড়ে থাকলেও কিছু জানবার উপায় নেই।

বি, এ, পাশ ক'রলাম, এম, এ, আর ল' প'ড়তে লাগলাম এখন মাষ্টারী ক'রে আর স্কলারশিপে যে টাকা পাই তাতে মনে হ'ল মাকে এনে ক'লকাতায় রাখতে পারি। নিয়ে এলাম মাকে। ছোট্ট একখানা বাসা ক'রে মাতাপুত্রে বাস করি।

মা ধ'রলেন, বিয়ে কর।

আমি বুঝিয়ে ব'ল্লাম "বউ এসে খাবে কি মা? আজ যে দু'পয়সা রোজগার ক'রছি এতে তো তিনটে পেট চালানই দায় —তা ছাড়া, এ রোজগারই বা ক'দিন।"

এ সব তুচ্ছ হিসাবের যুক্তি মায়ের কাণেই লাগে না।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ব'ল্লাম, "আচ্ছা, তুমি মেয়ে দেখ।" এক ঘটকীর কৃপায় একটা জায়গায় কথাটা অনেক দূর অগ্রসর হ'ল —কালীঘাটের এক মেয়ের সঙ্গে।

যেদিন মেয়ের বাপ এসে আমায় দেখে গেলেন, আর পাকা দেখার তারিখ ঠিক হ'ল, সেই দিন ল' কলেজে আমাদের হিন্দু ল'র প্রফেসার পড়াতে পড়াতে ব'ল্লেন যে একবার কোনও মেয়ে যদি উত্তরাধিকার পায় তবে তার পর তার চরিত্রদোষ হ'লেও তার সম্পত্তি যায় না। চরিত্রদোষ আগে থাকলেও কোনও দোষ হয় না, যদি ঠিক উত্তরাধিকারের সময়ে সে পাপ পথ ছেড়ে সচ্চরিত্র থাকে।

তাঁর লেকচার শুনে আমার বিশ্বাস হ'ল যে তার মা বেঁচে থাকতে থাকতে যদি মালতী তার স্বভাব সুধরে ভাল হয় তবে তার মা ম'লে সে হয়তো তার পিতার সম্পত্তি দাবী ক'রতে পারে! প্রফেসারের সঙ্গে কথাটা নিয়ে আলোচনা ক'রলাম, ঠিক মালতীর কথাটাই তাঁকে ব'ল্লাম একটা কাল্পনিক সমস্যার মত ক'রে। তিনি অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে ব'ল্লেন যে আমার অনুমানই ঠিক।

কলেজ থেকে বাড়ী ফিরেই আমি গেলাম কালীঘাটে মালতীর মায়ের সন্ধানে—এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে পারলাম না। উৎসাহে আশায় প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। স্থির ক'রলাম যেমন ক'রেই হোক মালতীর ঠিকানা জেনে নিয়ে তাকে উদ্ধার ক'রবো। তা' হ'লে তার পৈতৃক সম্পত্তি পেতে কোনও বাধা হবে না।

গিয়ে শুনলাম দু'দিন আগে মালতীর মা মারা গেছে। ওলাউঠা হ'য়েছিল। অসুখ হ'তেই সে ব'লেছিল ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে। সেখানেই সে মারা গেছে।

পরে জেনেছিলাম ক্যাম্বেল হাঁসপাতালেই রাখাল বাবু কাজ ক'রতেন!

ভাবতে লাগলাম বিচিত্র এই মেয়েটার মনের কথা। দুষ্টার একশেষ সে, স্বামীর ভালবাসার কোনও মর্য্যাদাই সে রাখে নি, তবু অসুখ হ'লেই সে ছুটে যেত ক্যাম্বেলে—শুধু সেই মৃত স্বামীর স্মৃতি লক্ষ্য ক'রে। কি তার মনে হ'ত কে জানে?

খবরটা শুনে আমি সেই বাড়ীর দোর গোড়ায় ব'সে প'ড়লাম।

মনে হ'ল সব শেষ হ'য়ে গেল। শুধু মালতীর উত্তরাধিকারের স্বত্ব গেল তাই নয়, তার খোঁজ পাবার যে ক্ষীণ সূত্রটুকু ছিল আমার তাও ছিঁড়ে গেল!

অনেকক্ষণ সেইখানে মাটিতে প'ড়ে রইলাম। কে এল কে গেল দেখতে পেলাম না।

একজন এসে সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে আমায়। ব'ল্লে, "বটুক বাবু নয়?"

আমি মুখ তুলে চাইলাম, দেখলাম চেনা লোক, আমার হবু শ্বশুর বাড়ীর লোক। আজই সকালে আমাকে দেখতে গিয়েছিল।

আমি মুখ তুলে চাইতেই লোকটা স'রে গেল!

তার পর যখন আমার এ বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল তখন মা খুব আশ্চর্য্য হ'লেন, কিন্তু আমি বুঝলাম। মালতীর মার বাড়ী ভদ্র পাড়ায় নয়—তার বাড়ীর দরজায় আমি খামখা ব'সে র'য়েছি, তাতে ভদ্রলোক ঠিক স্থির ক'রেছেন আমি বেশ্যাসক্ত। সেই কথা শুনেই মেয়ের বাপ বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন নিশ্চয়।

তাই ব'লে আমার বিয়ে ঠেকে রইলো না।

তখন আমি যাঁর ছেলেকে পড়াতাম, তিনি পুলিশ কোর্টের মস্ত বড় উকীল। সে বাড়ীতে আমার সুনামও ছিল, আদরও ছিল। ভদ্রলোক আমাকে গরীব জেনেও আমার সঙ্গেই তা'র মেয়ের বিয়ে দিলেন।

মিথ্যে জাঁক ক'রছি নে, আমার স্ত্রী অপূর্ব্ব সুন্দরী। চোখ যেন ঝলসে যায় তার রূপে। আর কি মধুর তার চরিত্র, কি

কোমল তার হৃদয়! আমার মনের সব সন্তাপ তার প্রেমের স্পর্শে মিলিয়ে গেল, আনন্দে আমি আত্মহারা হ'লাম।

আমি তাকে আদর ক'রে ব'লতাম, ভাঙ্গা ঘরের মণিদীপ। সে আমার বুকের ভিতর লতিয়ে গিয়ে দুষ্ট হাসি হেসে ব'লতো, "আর তুমি আমার 'বাঁদরের গলার মুক্তাহার'।"

"ঈস্।" ব'লে আমি তার মুখ চেপে ধ'রতাম।

* * * *

ল' পাশ ক'রে আমি আমার শ্বশুরের সঙ্গে পুলিশ কোর্টে বেরুতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে পশার জমে গেল। দশ বছর না যেতে যেতে শ্বশুরের খ্যাতি কাণা ক'রে দিলাম—এমনি হ'ল আমার নাম ডাক।

গোড়ায় শ্বশুর একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে দিয়েছিলেন, সেই খানেই সংসার পেতেছিলাম। এখন মস্ত একটা বাড়ী ক'রেছি। দাস দাসী মোটরগাড়ী প্রভৃতি কোনও আড়ম্বরই বাদ যায় নি আমার।

চাঁদের মত দুটি ছেলে হ'য়েছে। তার পর একটি ফুট ফুটে মেয়ে—তার নাম রেখেছি মালতী।

[১৩]

সৌভাগ্যের বন্যাস্রোতে প'ড়ে ভুলেই গিয়েছিলাম মালতীর কথা। তবু মনে হ'ত এক আধ দিন তার কথা। সুখের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে এক একবার মনে হ'ত তার কথা, যার জন্য এ সৌভাগ্য সম্ভব হ'য়েছিল।

মেয়েটার জন্মের সময় মনে হ'য়েছিল, তাই তার নাম রেখেছিলাম মালতী।

আমার স্ত্রী নাম শুনে ভারী খুসী হ'য়ে গেল। তাকে ব'লেছিলাম মালতীর কথা সব। বড় ভয়ে ভয়ে ব'লেছিলাম. না জানি সে কি ভাববে। কিন্তু সে আমার কথা সবই বিশ্বাস ক'রেছিল--সেই শুধু একা আমাকে বিশ্বাস ক'রেছিল এ জগতে। দেখে আমার মনটা উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিল। আনন্দে তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রেছিলাম সেদিন।

মেয়ের যেদিন নাম হ'ল আমার স্ত্রী সেদিন ব'ল্লে, "ভারী ইচ্ছে করে মালতীদি'কে দেখতে আমার। মনে হয় তাকে গড় হ'য়ে প্রণাম করি একবার।"

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে ব'ল্লাম, "কিন্তু সে যদি বাড়ীর কাছে আসে তাকে উঠতেও দেবে না তুমি ঘরে—ছোঁবেও না।"

"তা বই কি? যদি আমার সে ভাগ্যি হয় তবে দেখে নিও আমি তাকে কি করি!"

ভাবতে লাগলাম কথাটা। অনেক বছর হ'ল মালতী

আমাকে ছেড়ে গেছে। আজ যদি সত্যি সত্যি সে আসে তবে—তাকে হয়তো চেনাই যাবে না। অনেকদিন পর তার জন্য একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্লাম।

আমার বড় বড় মামলা মোকদ্দমার কথা আমি আমার স্ত্রীর কাছে প্রায় গল্প ক'রতাম। তখন আমার হাতে একটা খুব ভারী মামলা ছিল। একটি বড়লোক খুব একটা বিপদে প'ড়েছিলেন। একটা বেশ্যার মেয়ে তাঁর নামে একটা ভয়ানক কুৎসিত মামলা এনেছিল।

মোকদ্দমাটা সাজান—কেবল ভদ্রলোককে প্যাচে ফেলে মোটা টাকা আদায় ক'রবার চেষ্টা।

যে মেয়েটা নালিস ক'রেছিল তার মাই হ'ল আসল চক্রী। সেই চক্রান্ত ক'রে আমার মক্কেলটিকে প্যাচে ফেলেছিল। এত বড় হারামজাদী সে যে এমন পাপিষ্ঠা আমি পুলিশ কোর্টের দশ বছরের অভিজ্ঞতায় কোনও দিন দেখি নি।

আমার স্ত্রীর কাছে তার সব কথা ব'ল্লাম। শুনে সে মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্লে, "মা গো! মেয়েমানুষ হ'য়ে এমন ক'রলে কেমন ক'রে? এই বেশ্যা মাগী গুলো না পারে এমন কাজ নেই!"

পুলিশ কোর্টে আমি তা' অনেকবার দেখেছি—এদের অনেক মোকদ্দমা দেখেই মনে হ'য়েছে এরা সব পারে। স্ত্রীর কথা শুনে ব'ল্লাম, "তা' ঠিক।"

একটু পরেই ব'ল্লাম, "তোমার মালতীদিও বেশ্যা।" তাকে ব'ল্লাম, কিন্তু ব'ল্লাম সত্যি সত্যি আপনাকেই। এই কথাটাই তখন মনে হ'চ্ছিল আমার, ব্যথার সঙ্গে।

আমার স্ত্রী ব'লে, "তা হোক। সব বেশ্যাই একরকম হয় না।"

তার পর আমি মক্কেলদের নিয়ে ব'সলাম এই মোকদ্দমা সম্বন্ধেই পরামর্শ সভায়।

একটি লোক, অসম্ভব নোংরা—দাড়ী গোঁফে তার মুখখানা একদম ঢাকা—এসে আমার মক্কেলদের পাশে দাঁড়াল।

আমি গম্ভীর ভাবে মুখ তুলে ব'ল্লাম, "কি চাই?" লোকটা ব'ল্লে "আমায় চিনতে পারছ না বাবা বটুক?"

লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠলো। হাতের পেনসিল ফেলে দিয়ে আমি চমকে উঠে ব'ল্লাম "মামা?"

আহ্লাদে আটখানা হওয়া গোছ ক'রে তিনি ব'ল্লেন, "হাঁ বাবা। আমি জানি তুমি আমাকে চিনবে। ভগবানের ইচ্ছায় তুমি এখন বড় লোক হ'য়েছ। যে বড়লোক হয় সে সব দিকেই বড় হয়।" ইত্যাদি—

রাগে আমার গা জলে গেল, কিন্তু কিছু ব'লতে পারলুম না একে। মক্কেল গুলোর সামনে তাকে কিছু ব'লতে আমার লজ্জায় বাধলো। আমি উঠে গেলাম ভিতরে।

আমার স্ত্রীকে সামনেই পেলাম।

তাকে ব'ল্লাম, "শুনেছ,—মামা এসেছেন।"

"মামা—কোন মামা?"

"আমার মামা, সেই গুণধর। জেল থেকে খালাস হ'য়ে ভেবে চিন্তে বোধহয় আমারই কাঁধে ভর ক'রবে ব'লে এসেছে।"

"কি আস্পর্দ্ধা! খেংরা মেরে বিদায় ক'রতে হয় ওকে।"

"আস্পর্দ্ধা ব'লতে?—মা কোথায়?"

দুজনে মার কাছে গেলাম। মার তো শুনে চক্ষু স্থির!

আমি ব'ল্লাম, "কি করি বল তো? কি রকম ক'রে পাপ বিদায় করি?"

মা ব'ল্লেন, "যাই করিস বাবা, ভাল মুখেই করিস। হাজার হোক অনেক দিন ওর খেয়েছি—সুখে হোক, দুঃখে হোক, খেয়েছি। আজ দুঃখে প'ড়েছে ওকে গাল দিস নে।"

কথাটায় আমার স্ত্রীর দেখলাম মতটা হঠাৎ ঘুরে গেল, সেও ব'ল্লে, "হাঁ তাই ঠিক। এয়েছেন যখন, ওঁকে ভিতরে নিয়ে এস। নাওয়া খাওয়া হোক তার পর যা' হয় ব'লো'খন।"

এ সব কথা আমার মোটেই মনে ধ'রছিল না। আমার এতদিনকার পুঞ্জীভূত আক্রোশ তার উপর কেবলি গর্জ্জন ক'রে উঠছিল। আমি ব'ল্লাম, "সে কখনই হ'তে পারে না! ওই পাপিষ্ঠটাকে আমি বাড়ীর ভিতর কিছুতেই আসতে দেব না।"

আমার স্ত্রী ব'ল্লে, "কি যে বল তার ঠিক নেই। হাজার হোক সবাই জানছে"—

আলোচনার দরকার হ'ল না। মামা আপনি এসে বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হ'লেন। মাকে ডেকে ব'ল্লেন, "এই যে যোগী—ভাল আছিস বেশ।"

যোগমায়া আমার মার নাম।

মা অমনি জড় সড় হ'য়ে গড় হ'য়ে তাকে প্রণাম ক'রলেন।

আমার স্ত্রীও একহাত ঘোমটা টেনে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে স'রে গেল।

মা ব'ল্লেন, "এই যে দাদা, কখন এলে তুমি? বাড়ী গিয়েছিলে?" একগাল হেসে—যেন কত আদরের দাদা তাঁর! ভারী রাগ হল' আমার।

আমি রাগে গর গর ক'রে বাইরে চ'লে গেলাম।

মক্কেলদের বিদায় ক'রে আমি বাড়ীর ভিতর যখন গেলাম তখন দেখতে পেলাম মামা দিব্যি জমিয়ে ব'সেছেন। ইতিমধ্যে নাপিত ডেকে ক্ষৌরকর্ম্ম ক'রে নেয়ে উঠেছেন, আমারই ফরসা কাপড় জামা প'রেছেন, আমার স্ত্রীই তাঁকে বের ক'রে দিয়েছে। আসন পেড়ে ব'সে জল যোগ ক'রছেন প্রায় ষোড়শোপচারে। মা অনুগত দাসীর মত সামনে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্পসল্প ক'রছেন।

আড়াল থেকে শুনলাম মামা গল্প ক'রছেন ছেলে বেলায় যখন তাঁর কাছে ছিলাম তখন থেকেই আমার পড়াশুনায় কি অনুরাগ ছিল—সবাই কত সুখ্যাত ক'রতো! তখনই মামা ব'লতেন বটুক কালে বড় লোক হবে। ইস্কুল যেতাম মাষ্টারেরা মামাকে কত ব্যাখ্যান ক'রে ব'লতো আমার কথা।

শুনে আমার রক্ত টগবগ ক'রে ফুটতে লাগলো। একবার উঠলাম তেড়ে—আমার স্ত্রী আমার হাত ধ'রে করুণ নয়নে মিনতি ক'রে ব'ল্লে, "যাক, বলুক গে, ওর কথায় রাগ ক'রতে আছে!"

থেমে গেলাম, কিন্তু ব'ল্লাম, "তোমরা দু'জনে মিলে কি আরম্ভ

ক'রেছ বল দেখি—একেবারে যা আহ্লাদ দিচ্ছ ওকে—যেন বাপের ঠাকুর। এমন আদর পেলে ও এখান থেকে নড়বে ভেবেছ ?"

"তা হোক, যা' ব'লতে হয় ঠাণ্ডা সুস্থির হ'য়ে ব'লো। হাজার হোক উনি তোমাদের তবু কিছু তো ক'রেছেন একদিন।"

থমকে গেলাম।

শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু করেননি মামা, কিন্তু তবু একদিন গেছে যে তাঁর অশ্রদ্ধার দান পেয়েও আমাদের মা ছেলের প্রাণরক্ষা হ'য়েছে। তার জন্য এ পাপিষ্ঠকেও ক্ষমা করা আমার কর্ত্তব্য। একবার মনে হ'ল এ শুধু আমার ভীরুতা ঢাকবার একটা ওজুহাত—তবু কথাটা মেনে নিলাম।

ফলে দাঁড়াল এই যে শেষ পর্য্যন্ত মামাকে দেশে পাঠিয়ে দিলাম, মাসে দশ টাকা মুসাহরা বরাদ্দ হ'ল।

কিছুদিন পর শুনতে পেলাম মামা একটা বিয়ে ক'রেছেন। গা জ্বলে গেল শুনে। মনে হ'ল মামীর কথা! ইচ্ছা হ'ল—কি যে ইচ্ছা হ'ল সে আর ব'লে কি হবে। কিছুই ক'রলাম না আমি। মা নূতন মামীমাকে প্রণামী পাঠিয়ে দিলেন।

এত বড় পাপিষ্ঠকে যে আমি এমনি ক'রে প্রশ্রয় দিলাম তাতে আমি যেন আমার নিজের চোখে খাটো হ'য়ে গেলাম। আমার মনে হ'ল আমার পুরুষোচিত কর্ত্তব্য হ'ত ওকে গলাধাক্কা দিয়ে সোজা ফটকের বের ক'রে দেওয়া। তা যে পারিনি সেটা শুধু মা বা স্ত্রীর অনুরোধে নয়, কতকটা আমারই দুর্ব্বলতার জন্য। পাপীর প্রতি উচিত ব্যবহার ক'রতে এই যে সঙ্কোচ এর জন্য আমি নিজকে প্রশংসা ক'রতে পারলাম না।

[১৪]

কয়েকদিন পর সেই বড় মোকদ্দমাটা আরম্ভ হবে।

বাদিনী এল কাঠগড়ায়—অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মেয়ে ষোল সতেরো বছর বয়েস। আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

আমার মক্কেল আমাকে ব'লেছিল তাকে মিথ্যা ক'রে ফাঁসাবার জন্যে এই মেয়েটা আর তার মা দুজনে মিলে অসম্ভব রকম সব কুকার্য্য ক'রেছে। মেয়েটার মুখ দেখে বা কথা শুনে মনে হ'ল না যে তার পক্ষে এমন শয়তানী সম্ভব।

জেরার জন্য কতক নোট ক'রেছিলাম। নোটগুলো উল্টে পাল্টে দেখলাম। সামান্য দু'চারটে কথা জিগ্‌গেস ক'রে তাকে ছেড়ে দিলাম।

তার পর এলো মেয়েটার মা—পাপের জীবন্ত মূর্ত্তি। তিনটে হাতীর সমান মোটা সে, আর নিদারুণ কুৎসিৎ। মুখময় তার কালো কালো দাগ—কুৎসিৎ ব্যাধির ছাপ। এক চোখ তার কাণা—আর তার হাব ভাব চলন চালন একটা কদর্য্য ভাবে ভরা।

আদালতে সাক্ষী দিতে এয়েছে সে, তবু তার মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। দেখলেই ঘেন্না করে।

অসম্ভব ফাজিল সে। তার কণ্ঠস্বর নেশায় আর অত্যাচারে ভেঙ্গে গিয়ে একটা বিকৃত ভাব ধারণ ক'রেছে। সেই ভাঙ্গা গলায় চড়া সুরে সে অনর্গল বকছে, ইয়ার্কী ক'রছে।

তার নাম ব'ল্লে হিঙ্গন বাঈ। বাপের নাম জিজ্ঞাসা ক'রতেই উর্দ্দুতে ব'ল্লে, "বাপের নাম কি জিজ্ঞাসা ক'রছো বাবু, আমাদের কি বাপ থাকে ?" ব'লে খিল খিল ক'রে হাসলে।

তার হাসিটা কিন্তু মিষ্টি।

তার জবান বন্দী দেবার পর সেদিনকার মত কাজ শেষ হ'ল, পরের দিন আমার জেরা করবার কথা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় জুনিয়ারদের আর মক্কেলকে নিয়ে ব'সে খুব ক'সে তৈয়ার হ'লাম জেরার জন্য। আমার হাতে যা প্রমাণ ছিল তাতে আমার সন্দেহ রইল না যে ওকে জেরায় কাবু ক'রে শুধু আমার মক্কেলকে খালাস করবো তাই নয়—তাতে এমন সব কথা বের ক'রবো যে ওকেই জেলে যেতে হবে—ওর যে পাপের সীমা নেই।

পরের দিন জেরা সুরু হ'ল।

একটু লঘুভাবে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম "বলি হিঙ্গন বাইজী, তোমার এ নাম ক'দিন হ'য়েছে ?"

সে চট্ ক'রে ব'ল্লে, "নাম আবার ক'দিন থেকে হয় লোকের—য'দিন বয়েস ততদিন নাম। নাম কি হরঘড়ি বদলায় নাকি ?"

"কিন্তু তোমার এ নামের বয়েস দু'বচ্ছর, কেমন ?"

হো হো ক'রে হেসে সে ব'ল্লে, "এর পর ব'লবে আমার এই চুলের বয়েস দু' বচ্ছর।" ব'লে ফস ক'রে তার কেশরাশি হাত দিয়ে ছড়িয়ে ধ'রলে।

দেখলাম কেশে তার শোভা আছে।

আমি তখন রূঢ় স্বরে ব'ল্লাম, "ফাজলেমো রাখ—তুবচ্ছর আগে তোমার নাম ছিল আখ্তার বিবি !"

সে ফস ক'রে পরিষ্কার বাঙ্গলায় ব'ল্লে, "দূর, তা কেন হবে ?"

আমি চমকে গেলাম। আমার খবর ছিল মেয়েটা পাঞ্জাবী, এখন ভোল ফিরিয়ে কাশীর লোক ব'লে আপনাকে চালাচ্ছে। বাঙ্গলা দেশে এসেছে বড় জোর চার বছর। কিন্তু তার বাঙ্গলা কথার ভিতর কোনও আড়ষ্টতা নেই। কথাটা তখনকার মত নোট ক'রে ভাবতে লাগলাম। ·

আখ্তার বিবি নাম নিয়ে মেয়েটা যে সব কুকীর্ত্তি ক'রেছে পুলিস ডায়েরীতে তার অনেক খবর ছিল—কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি ব'লে তার কোনও কিনারা হয় নি। সেই সব ঘটনা সম্বন্ধে তাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অনেক কথা জিগ্‌গেস ক'রলাম, অপর পক্ষে আপত্তি হ'ল এ সব প্রশ্নে। কিন্তু হিঙ্গন বাঈ সে আপত্তির আগেই চট্ পট্ জবাব দিয়ে সব কথা ঝেড়ে অস্বীকার ক'রলে।

তার পর আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "তুমি পাঞ্জাবী ?"

সে ব'ল্লে, "না, আমার বাড়ী বেনারস—পাঞ্জাব আমার বাপ দাদা কেউ চোখে দেখে নি।"

হাকিম হেসে ব'ল্লে, "বাপ দাদা তোমার আছে তা' হ'লে ?"

সপ্রতিভ ভাবে হিঙ্গন ব'ল্লে, "বাপ একজন কেউ তো আছে।"

আমি নোটগুলো নাড়তে নাড়তে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলাম একটা কথা।

আমার দেরী দেখে হাকিম ব'ল্লেন "জিগ্‌গেস করুন বটুক বাবু।"

আমি কঠোর দৃষ্টিতে হিঙ্গনের দিকে চাইতেই দেখলাম সে যেন একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছে! আমি চট্ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তুমি বাঙ্গালী, বল হাঁ কি না।"

মেয়েটা একটু থেমে গেল, তার পর হঠাৎ হেসে উঠলো; ব'ল্লে, "হাঁ, ঠিক ধরেছ ভাই!"

তার এই প্রিয়সম্ভাষণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে চড়া সুরে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "বাঙ্গালী হ'য়ে তুমি হিন্দুস্থানী সেজে নাম ভাঁড়িয়ে আছ?"

হেসেই সে ব'ল্লে, "হাঁ নাম ভাঁড়িয়েছি—কেন যে ভাঁড়িয়েছি সে তুমি খুব ভাল ক'রেই জান।"

প্রথমে কথাটায় চ'টে গেলাম। তার পর তার দিকে চেয়ে হঠাৎ একটা কথা মনের ভিতর চমক দিয়ে গেল। আমি কাঁপতে লাগলাম। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তার দিকে চাইলাম।

সে হেসে ব'ল্লে, "কি? চিনতে পারছ না?—আমি যে তোমার মালতী গো; মনোহর পুকুরের সেই মালতী!" ব'লে হেসেই কুটো পাটি।

মালতীই সে, কোনও সন্দেহ নেই। রোগে ভোগে পাপে তার মূর্ত্তি শ্রীহীন হ'য়ে প'ড়েছে কিন্তু এখন দেখতে পেলাম পরিষ্কার সেই এ!

মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে উঠলো।

মালতী আমাকে অপদস্থ করবার জন্যই এমনি ক'রে কথাটা প্রকাশ ক'রলে। হাকিম আমাকে নাম ধ'রে ডাকতেই সে আমাকে চিনতে পেরেছে, আর তার পরই আদালতের এক হাট লোকের সামনে

আমাকে অপমান ক'রবার জন্যই এমনি কুৎসিৎ ইঙ্গিত ক'রে কথাটা ব'ল্লে।

রাগের চেয়ে দুঃখ হ'ল বেশী। মালতী যে এমন হ'য়েছে, এত দূর পাপিষ্ঠ হ'য়েছে যে আমার সম্বন্ধেও এই কদর্য্য ইঙ্গিতটা ক'রতে তার বাধলো না, তাতে আমার বুক ভেঙ্গে গেল।

আমি ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়লাম—আদালতে খুব ভীড় হ'য়েছিল —চার দিকে চাপা হাসি আর টিটকারী শুন্‌তে পেলাম, হাকিমও একটু মুচকি হাসি হাসলেন। সে সব লক্ষ্য ক'রলাম না। আমার মনের ভিতর আগুণ ছুটছিল—কিছু ভাববার শক্তি ছিল না। আমি মাথা নীচু ক'রে ব'সে প'ড়লাম।

যখন কথা কইবার শক্তি হ'ল তখন আমার জুনিয়ারকে ব'ল্লাম, আমি এ মোকদ্দমা আর ক'রতে পারবো না, হাকিমকে ব'লে সময় নিতে ব'ল্লাম। নিজে দাঁড়িয়ে সময় চাইবার শক্তি হ'ল না।

একবার চেয়ে দেখলাম—মালতী কাপড়ে মুখ চেপে ভয়ানক হাসছে—ভাবটা এই যে খুব জব্দ ক'রেছে সে আমাকে! ঘৃণায়, দুঃখে আমার সমস্ত দেহে যেন বিষ ছড়িয়ে প'ড়লো।

হাকিম সেদিনকার মত মামলা মুলতবী ক'রলেন।

আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বাড়ী চ'লে গেলাম কাছারী সুদ্ধ লোক ভীড় ক'রে এলো আমাকে দেখতে—যেন একটা ভারী মজা হ'য়ে গেছে। অপমান, লাঞ্ছনার শেষ রইলো না আমার, কিন্তু সে কথা মনে হ'ল না আমার। আমার মনটা ছেয়ে রইলো শুধু এই চিন্তা—এই মালতী!

মালতীকে দেখবার জন্য ভগবানের কাছে অনেকবার প্রার্থনা ক'রেছি—এ কী দেখলাম ! এর চেয়ে না দেখা যে ছিল ভাল।

মোকদ্দমা আমি ছেড়ে দিলাম। মালতীর সব কীর্ত্তি কথা, তার চরিত্র সবই আমি জেনেছিলাম—তাকে দেখেওছি। সে সব জেনে আর তাকে দেখে এত ঘৃণা হ'য়েছিল যে অতীতের স্মৃতির জের টেনে তার প্রতি একটুও ভক্তি শ্রদ্ধা বা প্রীতি অনুভব ক'রতে পারলাম না। নরকের কীট বই আর কিছুই তাকে ভাবতে পারলাম না।

তবু,—জেরা ক'রে তার সমস্ত কাহিনী প্রকাশ ক'রে দিয়ে যে তার জেলে যাওয়া অনিবার্য্য ক'রে ফেলবো সে শক্তি আমার হ'ল না। আমি এতদিন ধ'রে যত্নক'রে তার মৃত্যুবাণ রচনা ক'রেছিলাম—কিন্তু তা' ছুঁড়বার শক্তি ছিল না আমার। যে প্রমাণ আমি সংগ্রহ ক'রেছিলাম তাতে আমার মক্কেল খালাস পাবে, কিন্তু মালতীর তাতে জেলে যেতে হবে! তাই সে প্রমাণ প্রয়োগের ভার আমি নিতে পারলাম না।

অন্য উকীল পাওয়া গেল। আমার তৈয়ারী মাল মসলা নিয়ে তিনি মোকদ্দমা চালালেন। মক্কেল বেকসুর খালাস হ'ল। কিন্তু মালতীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল তখনি।

কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আমি সি, আই ডি'র কাছে সাহায্য নিয়েছিলাম। আখ্‌তার বিবির নামে তাদের অনেকগুলি ওয়ারেন্ট ছিল—তারা অনুসন্ধান ক'রে আমার সাহায্য ক'রেছিল। এখন সেই অনুসন্ধানের ফলে তারা মালতীকে গ্রেপ্তার ক'রলে।

[১৫]

কয়েক দিন মড়ার মত প'ড়ে রইলাম। কাজকর্ম্মে রুচি হ'ল না। আমার জীবনের সব সুখ সৌভাগ্য তিক্ত হ'য়ে গেল।

মা ব'ল্লেন, "তোর কি হ'য়েছে বাবা ?"

কিছু ব'লতে পারলাম না তাঁকে।

স্ত্রীকে এড়াতে পারলাম না তাকে ব'লতে হ'ল সব কথা।

প্রথমে মালতী এসেছে শুনে সে ভারী উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিল। সব কথা শুনে সে শেষ পর্য্যন্ত কেঁদে ফেল্লে।

আমি ব'ল্লাম, "কি করি বলতো ? ওই নরকের কীটটার দিকে চাইতেও আমার ঘেন্না করে। কিন্তু তবু—কি করি ?"

আমরা দুজনে ভেবে চিন্তে স্থির ক'রলেম যে হোক মালতী পাপিষ্ঠা—তবু আমার তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা ক'রতেই হবে।

মামাকে আশ্রয় দিয়েছি, আর মালতীর কিছু ক'রবো না ?

গেলাম মালতীর সঙ্গে দেখা ক'রতে। সে দেখা ক'রলে না, এল তার মেয়ে।

আমি মুগ্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলাম।

মালতীরই মেয়ে, তার চেয়েও সুন্দর !

আমাকে তার দিকে অমনি ক'রে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা ফিক্ ক'রে হাসলে। তার হাসি দেখে আমার হুঁস হ'ল। বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লাম মালতীর সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই।

মেয়ে ব'ল্লে, মাইর তবিয়ত ভাল নেই। খাঁটি উর্দ্দূতে কথা কয় সে—ভারী মিষ্টি সে কথা।

আমি ব'ল্লাম, "আচ্ছা, তবে তাকে বল গিয়ে যে তার মোকদ্দমা আমি ক'রতে চাই।"

মেয়ে ভিতরে গিয়ে ফিরে এসে ব'ল্লে যে মাইয়ের পক্ষে উকীল ব্যারিষ্টর সব মোকরর হ'য়ে গেছে, আমার তকলিফ করবার জরুরত নাই।

আমি বল্লাম, তকলিফের জন্য তার চিন্তা নেই, টাকাও লাগবে না তার, আমি শুধু তার কাজ ক'রতে চাই।

আবার ভিতরে ঘুরে এসে সে ব'ল্লে মাই বহুত সেলাম জানিয়েছেন আমার মেহেরবাণীর জন্য কিন্তু কোনও জরুরত নাই।

কি আর ক'রবো—ফিরে এলাম।

যে ক'দিন মালতীর মোকদ্দমা হ'ল, কোর্টে গেলাম না।

এক ঝুড়ি চার্জ্জ ছিল তার নামে। সেই যে আখতার তা প্রমাণ হ'য়ে গেল। সব জুড়ে দশ বচ্ছর জেল হ'ল তার।

আমার সুখশয্যা কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে গেল।

জেলে তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলাম। দেখা হ'ল।

দেখলাম আমার আগেই গিয়ে ব'সে আছে একটা দিল্লীওয়ালা। তাকে দেখে কি জানি কেন, গা জ্বলে গেল।

মালতী আমাকে দেখে ব'ল্লে, "এই যে উকীল বাবু!" বলে নিরর্থক একটু হাসলে। বুঝতে পারলাম হাসিটা শুধু সঙ্কোচ ঢাকবার একটা আবরণ।

তারপর সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তার পর সেই দিল্লীওয়ালা ব'ল্লে, "এখন যাই।"

মালতী পরিষ্কার উর্দ্দূতে তাকে নানা রকম কাজের দেখা শোনা করবার শেষ উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলে।

তার পর সে একটু মুখ ফিরিয়ে রইলো, চোখে চোখে চাইতে পারলে না। আমিও কিছু ব'লতে পারলাম না। এই কুৎসিৎ ঘৃণ্য মুর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমি কিছুতেই মনের ভিতর সেই শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা টেনে আনতে পারলাম না যা মালতীর আমার কাছে ন্যায্য পাওনা।

একটু বাদে মালতী মুখ তুলে চেয়ে ব'ল্লে, "আমাকে দেখে তোমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে,—না?" বলে হা হা ক'রে খানিকটা হাসলে।

আমি গম্ভীরভাবে ব'ল্লাম, "তুমি কেন অমন ক'রে পালিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে? নইলে—"

"নইলে আর মানুষ হ'তে হ'ত না চাঁদ। আমার পাল্লায় প'ড়লে তুমিও ঠিক এমনি হ'তে!

"কখনও না।"

অবজ্ঞার হাসি হেসে সে ব'ল্লে, "ওঃ কত টন্‌টনে ধার্ম্মিক দেখলাম—আমার চোখের মটকে ভেসে গেল।" এই স্পর্দ্ধা সে নানা ছন্দে ক'রে গেল, কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিল। তার কথা অকথ্য অশ্লীলতায় ভরা; আর মানুষকে নষ্ট ক'রবার এই শক্তিতে আর তার মোহিনী শক্তির বিজয়ের গৌরবে সে খুব গর্ব্ব ও উল্লাস অনুভব করে

তা স্পষ্ট দেখা গেল! সে সব কথা শুনে আমার মনটা দারুণ ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। এত কদর্য্য অন্তর হ'য়েছে সেই মালতীর!

ব'ল্লে, "এত লোক গেল ভেসে তুমি তো কোন ছার। চোখের এক মটকে আমি তোমাকে আমার গোলাম ক'রে ফেলতাম। মাইরি তোমার চেহারাখানা দেখলে লোভ হয়। মনে হয় তোমায় ছেড়ে দিয়ে ঠ'কে গেছি। এখন যদি থাকত সে দিন তবে দেখে নিতাম।"

আমি শিউরে উঠলাম। জিভ্ কেটে ব'ল্লাম, "ছি, অমন কথা মুখে আনছ কেমন ক'রে? আমি যে তোমার ভাই!"

সে হো হো ক'রে হেসে উঠে আমার পিঠ চাপড়ে ব'ল্লে—"এঃ, বাচ্চা—একদম বাচ্চা হো তুম্!"

আমায় কে যেন চাবুক মারলে।

কথাটা ঘুরিয়ে আমি তার এ ক' বছরের জীবনের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম। সে ব'ল্লে সব—অনর্থক অশ্লীলতার বাহুল্য ক'রে ব'ল্লে। ব'ল্লে আমাকে টাকা কড়ি দিয়ে মুক্তি দেবার আশায় সে একেবারে ডুব মেরেছিল। পাছে খুঁজে পাই তাই নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন ছিল ক'লকাতায়। তারপর এক পাঞ্জাবী রাজাকে হাত ক'রে ভোল ফিরিয়ে একদম্ পাঞ্জাবী হ'য়ে গেল। তার পর তার সঙ্গে পাঞ্জাব চ'লে গেল। তার পর কত জায়গায় গেল। শেষে মেয়েটা বড় হ'তে ক'লকাতায় এলো, বেশী রোজগারের আশায়।

আমি ব'ল্লাম, "তুমি এত সব পারলে? তুমি সেই মালতী—তুমি এ সব ক'রলে কেমন ক'রে?"

সে হেসে ব'ল্লে, "প্রথম প্রথম একটু বাধতো—হাজার হোক ভদ্রলোকের মেয়ে! কিন্তু মনোহরপুকুরে সেই যে মদ খেতে শিখে-ছিলাম তাইতে বেঁচে গেলাম। দেদার মদ খেতাম—মদ খেলে কোন কিছুই আমার বাধতো না। বজ্জাতির নতুন নতুন সব খেয়াল মাথায় আসতো—যা মনে হ'ত অমনি ক'রতাম। এমনি ক'রতে ক'রতে সবই রপ্ত হ'য়ে গেল। এখন আর কিছুতে বাধে না।"

ব'লেই ব'ল্লে, "হাঁ উকীল বাবু, তুমি তো পুলিস কোর্টের উকীল, এখানকার লোকের সঙ্গে জানা শোনা আছে। আমার একটা উপায় ক'রে দিতে পার? একটু মদ পাবার উপায় ক'রে দিতে পার? মদের অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছি। যেদিন এলাম খুব পেট ভ'রে খেয়ে এসেছিলাম—তাতে সারাদিন চ'লেছিল। তার পর আর পাইনি।"

আমি উঠলাম। এর সঙ্গে কথা কওয়া বৃথা! এ সে নয়। যাকে আমি শ্রদ্ধা ক'রেছি, ভালবেসেছি—সে মরে গেছে! ম'রে গেলেও যে ছিল ভাল, এর চেয়ে!

আমি উঠতে সে ভয়ানক কাকুতি মিনতি ক'রতে লাগলো একটু মদের জন্য—যদি কোনও উপায় ক'রতে পারি। যতই তার এ আকুলতা দেখলাম ততই ঘৃণায় মনটা ভ'রে গেল।

বাইরে যখন এলাম তখন মনটা ভয়ানক ভার হ'য়ে গেল। সে চোখের আড়ালে যেতেই তার বীভৎসটা আর আমাকে অভিভূত ক'রলো না—মনে হ'ল বড় করুণ তার এ পরিণতি!

দেবী সে হ'তে পারতো, যদি অবসর পেত। পাপে যখন তার হাতে খড়ি তখন সে কিছু জানতো না, তবু সে তাতে বিরক্ত ছিল,

তখনও তার ভিতরকার মহানারী তাকে টেনে ফেরাতে চাচ্ছিল। কিন্তু মায়ের ব্যভিচারে যার আরম্ভ হ'য়েছিল, সে পতন সমাপ্ত ক'রলে সুরা।

দেখতে দেখতে পাপের অষ্টবন্ধনে সে বাঁধা প'ড়ে গেল—মুক্তির কোনও পথই তার রইল না, মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও মুছে গেল মন থেকে।

দেবী হ'য়ে জন্মেছিল সে—নরকের কীট হ'য়ে গেল। হৃদয়-মন্দিরে দেব পূজার পূণ্য প্রদীপ তার জ্বলেছিল—নিভে গেল তার শিখা পাপের পূতিগন্ধ বাষ্পে!

একটা অমূল্য আত্মা এমনি ক'রে ধ্বংস হ'য়ে গেল।

* * *

মালতী দিদির কিছুই ক'রতে পারলাম না আমি—করবার কিছু নেই।

তার মেয়েকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলাম—পারি নি।

আমার জীবনে যা' কিছু হ'য়েছে তার জন্য আমি মালতীর কাছে ঋণী। সে ঋণের এক কণাও শোধ ক'রতে পারলাম না। র'য়ে গেলাম দেনদার।

This book is full of pathetic scenes indeed. But we cannot but grieve at the sight of the downcast and downfall

Of Malati — don't know brother, "Malati" is the downcast. The writer is Malati, is the writer a writer his environment ... the Heroine of the Book

[illegible]

গ্রন্থকার প্রণীত কয়েকখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বাঙ্গলার কথা সাহিত্যে যাঁহারা নূতন ও স্থায়ী সম্পদ দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নরেশবাবুর নাম কাহারও নীচে নয়, এ কথা আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার কাছে সুপরিচিত। ইহাঁর রচনার প্রত্যেকটির অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ, কথা গাঁথিবার অপূর্ব্ব কুশলতা ও চরিত্র সৃষ্টির আলোকসামান্য শক্তি, বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সাহিত্যে নূতন পন্থা ও নূতন রূপ আবিষ্কারে, তাঁহার কৃতিত্বও যেমন, সাহসও তেমনি।

নরেশ বাবুর আর একটা বিশেষত্ব এই যে তাঁর গল্পের বই কেবল গল্প নয়। ইহা পড়িয়া ফেলিয়া দিলেই মিটিয়া যায় না, ইহা ভাবাইয়া দেয়। সমাজের ভিতর, মানুষের জীবনের ভিতর যে নানা সমস্যা লুকাইয়া আছে তাহা তিনি খোঁচাইয়া বাহির করিয়াছেন এবং তাঁর ভাবুকতা পাণ্ডিত্য ও ভাষার অসামান্য লালিত্য ও প্রাঞ্জলতার সহায়ে তিনি সে গুলি পাঠকের চিত্তে বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত করিয়া তোলেন।

সতী—আদর্শ সতী-সাধ্বী নারীর অপূর্ব্ব চিত্র। এই গৌরবময়ী. দৃঢ় চিত্ত, সতী-সাধ্বী স্নেহময়ী সুরমা আর তার পাশে জ্যোতিঃ—সেবাব্রত, সত্যনিষ্ঠ আত্মবিস্মৃত মহাপুরুষ—ইহাদের পদতলে বাঙ্গালী নরনারীর মাথা আপনি নোয়াইয়া পড়িবে। ঘরে ঘরে যদি সুরমার মত সতী-সাধ্বী স্নেহময়ী নারী আর জ্যোতির মত মহাপুরুষ গড়িয়া উঠে তবে বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের অন্ত থাকিবে না।

সতীত্বের নামে কত না দুর্ব্বলতা সমাজে পূজা পাইতেছে—প্রকৃত সতী কাহাকে বলে গ্রন্থকার তাহা অপূর্ব্ব সার্থকতার সহিত এই উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নরেশবাবুর এরূপ উপন্যাস এই প্রথম।—মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

"বিচিত্রা" জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

………শক্তিমান্ লেখকের এ উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকা তৃপ্তিলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"বাঙ্গালার কথা" ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৫

………কিন্তু সতীর স্বামীকে উপন্যাসের গোড়াতেই বিপথে যাইতে দেখিয়াও শেষ পাতা পর্য্যন্ত না পড়িয়া আমরা যে বই মুড়িয়া রাখিতে পারি নাই নরেশ বাবুর শক্তির ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ।

রূপের অভিশাপ—গরীব চাষীর মেয়ে পরীর মত রূপ লইয়া জন্মাইয়াছিল পরী—সে রূপ যে কত বড় অভিশাপ—কেমন করিয়া যে সে তার সমস্ত নারী জীবন ক্রমশঃ পোড়াইয়া দিল তার একটি পরম করুণ জীবন্ত চিত্র।—মূল্য দুই টাকা।

পূর্ণচ্ছেদ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

'পূর্ণচ্ছেদ' একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস। গ্রন্থকার সরল ভাষায় 'বড় বউ' ও 'ফকিরের' যে অপূর্ব্ব চরিত্র এই উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক যুবক বৃদ্ধের কাছে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। —মূল্য দেড় টাকা।

গরীবের ছেলে—সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সরোজ—সৌখীন্ রুচিসম্পন্ন তরুণ যুবক ও পল্লীর দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বিধবার পুত্র। কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থায় আধুনিক অভিজাত সমাজের অসামান্য রূপসী তরুণী ধনীকন্যা মীনা রায়ের চটুল চপল চাহনি, প্রতি-মধুর আলাপ—মিষ্টহাসি—অটুটযৌবন—সরোজের প্রাণে লুব্ধ পিপাসা জাগাইয়া তুলিল।

শেষে সরোজ নিজের জীবনে কি ট্রাজেডির সৃষ্টি করিল তাহা পড়িয়া দেখুন!—মূল্য দুই টাকা মাত্র।

পঞ্চশর—প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত।

বিংশ শতাব্দীর যৌবনবেদনার বিচিত্র কাহিনী।—পাঠক পাঠিকার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিবে।—মূল্য পাঁচসিকা।

যাযাবর—প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রণীত।

"নবশক্তি" ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬,

"উপন্যাস খানি শেষ করিয়া পাঠকের মানস নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে জীবনের ব্যথা ম্লান অশ্রুসজল অপরূপ ছবিগুলি। বাঙালী পাঠক পাঠিকা মাত্রকেই এই সুন্দর উপন্যাসখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"—মূল্য পাঁচ সিকা।

নানাসাহেব—শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত।

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে"—এই সর্ব্বজন পরিচিত ছড়া কত কাল হইতে বঙ্গপল্লীর ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার মন্ত্ররূপে মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে—নানাসাহেব, সেই বর্গীদেরই অন্যতম নায়ক। তাঁহার নাম শুনিলে এক সময় শিশু ত' দূরের কথা বুড়োদের মনেও আতঙ্কের সঞ্চার হইত। শিপাহী বিদ্রোহের অধিনায়করূপে নানা ইংরাজের হৃদয় শোনিতে ভারতের শ্যামল বক্ষ কর্দ্দমিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর আদেশে অসংখ্য ইংরাজ—বৃদ্ধ রুগ্ন বালক বালিকা পর্য্যন্ত নিহত হইয়াছিল নানাসাহেব তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।—মূল্য আড়াই টাকা।

সোনার পাহাড়—শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত।

একাধারে উপন্যাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং আমেরিকার দুর্গম প্রদেশের অপরিজ্ঞাত অংশের আবিষ্কার কাহিনী। উপন্যাসের প্রধান নায়ক ফেল্‌জি জাহাজের নাবিক। সে আটলাণ্টিক মহাসাগর-বক্ষে একখানি ভেলা ভাসিতে দেখিয়া কয়েক জন সহকর্ম্মীর সহিত জাহাজ হইতে সেই ভেলায় অবতরণ করে। কিন্তু ভেলায় তাহারা একটি মৃতদেহ, এবং সিন্দুকের ভিতর একটি নরমুণ্ড ও রাশিকৃত পাকা সোনা দেখিতে পায়। ভেলার আরোহীর 'ডায়েরী' পাঠ করিয়া তাহারা সোনার পাহাড়ের সংবাদ জানিতে পারে। তাহার পর তাহারা অসংখ্য লোমহর্ষণ বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া কত কষ্টে সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইল, এবং সেখানে তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিল, তাহার কৌতুকাবহ লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠে স্তম্ভিত হইতে হইবে। এরূপ বিস্ময়কর, ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যে দুর্লভ। ইহার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর। প্রায় পৌনে চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কিন্তু মূল্য অতি সুলভ।—দুই টাকা মাত্র।

